২´	৩	০	১
I মা মা -া গা ।	-া রা রা -া ।	ন্‌া -রা সা -া ।	-া -া -া -া I
(১) মু স ল্‌ মা	০ ন খৃ ০	ষ্টা ০ নী ০	০ ০ ০ ০
(২) মু খ রি ত	প থ দি ন	রা ০ ত্রী ০	০ ০ ০ ০
(৩) ন ত ন য়	মে ০ অ নি	মে ০ বে ০	০ ০ ০ ০
(৪) ন ব জী ০	ব ন র স	ঢা ০ লে ০	০ ০ ০ ০

২´	৩	০	১
I সা -া সা সা ।	সা -া সা সা ।	ন্‌া -সা রা -া ।	-া -া -া -া I
(১) পূ ০ র ব	প ০ শ্চি ম	আ ০ সে ০	০ ০ ০ ০
(২) দা ০ রু ণ	বি ০ প্ল ব	মা ০ ঝে ০	০ ০ ০ ০
(৩) দুঃ ০ স্ব প্নে	আ ০ ত ০	ছে ০ ০ ০	০ ০ ০ ০
(৪) ত ব ক রু	ণা ০ রু ণ	রা ০ গে ০	০ ০ ০ ০

২´	৩	০	১
I রা রা রা রা ।	রা -া রা রা ।	সা -রা গা -া ।	-া -া -া -া I
(১) ত ব সি ং	হা ০ স ন	পা ০ শে ০	০ ০ ০ ০
(২) ত ব শ ং	খ ০ ধ্ব নি	বা ০ জে ০	০ ০ ০ ০
(৩) র ০ ক্ষা ০	ক রি লে ০	অ ০ ছে ০	০ ০ ০ ০
(৪) নি ০ দ্রি ত	ভা ০ র ত	জা ০ গে ০	০ ০ ০ ০

২´	৩	০	১
I গা -া গা গা ।	রা গা রা রা ।	ন্‌া -রা সা -া ।	-া -া -া -া I
(১) প্রে ০ ম হা	০ র হ য়	গাঁ ০ থা ০	০ ০ ০ ০
(২) সং ০ ক ট	দুঃ ০ খ ০	ত্রা ০ তা ০	০ ০ ০ ০
(৩) স্নে ০ হ ম	য়ী ০ তু মি	মা ০ তা ০	০ ০ ০ ০
(৪) ত ব চ র	ণে ০ ন ত	মা ০ থা ০	০ ০ ০ ০

২´	৩	০	১
I পা পা পা পা ।	পা -া পা পা ।	পা -া পা পা ।	ক্ষা ধা পা -া I
(১) জ ন গ ণ	ঐ ০ ক্য বি	ধা ০ য় ক	জ য় হে ০
(২) জ ন গ ণ	প থ প রি	চা ০ য় ক	জ য় হে ০
(৩) জ ন গ ণ	দুঃ ০ খ ০	ত্রা ০ য় ক	জ য় হে ০

২´	৩	০	১
I মা -া মা মা ।	গা -া রা রা ।	ন্‌া -রা সা -া ।	-া -া -া -া I
(১) ভা ০ র ত	ভা ০ গ্য বি	ধা ০ তা ০	০ ০ ০ ০
(২) ভা ০ র ত	ভা ০ গ্য বি	ধা ০ তা ০	০ ০ ০ ০
(৩) ভা ০ র ত	ভা ০ গ্য বি	ধা ০ তা ০	০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I পা পা পা পা। পা পা পা -া। পা না ধা -া। পা -ক্ষা ধা পা I
(৪) জ য় জ য় জ য় হে ০ জ য় রা ০ জে ০ শ র

I মা -া মা মা। গা -া রা রা। না -রা সা -া। -া -া -া -া I
(৪) ভা ০ র ত ভা ০ গ্য বি ধা ০ তা ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I না না র্সা -া। না ধা না -া। -া -া পা পা। ধা -া -া -া I
(১,২,৩,৪) জ য় হে ০ জ য় হে ০ ০ ০ জ য় হে ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I সা সা রা রা। গা গা রা গা। মা -া -া -া। -া -া -া -া II
(১,২,৩,৪) জ য় জ য় জ য় জ য় হে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

গান।

চেয়ে রও সেই একের পানে,
মনঃপ্রাণে যে তোমায় জানে ;
যাঁহার দয়ার নাহি-ক সীমা,
আকাশ বাতাস গায় মহিমা ;
নদী বয় সাগর পানে
যাঁর প্রেমের টানে।

লুকায়ে গোপন বুকের মাঝে
জীবনে-মরণে বিরাম-কাজে,
সবায় টানে আপন পানে,
কভু বাধা না মানে ;
চেয়ে রও সেই একের পানে,
মনঃপ্রাণে যে তোমায় জানে ॥

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

তপস্যা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(১০)

সুধীর চলিয়া যাইবার পর লীলা বড় কাঁদিল। নিজের শয়ন কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয্যায় পড়িয়া লুটোপুটি খাইয়া কাঁদিল।—"হা নির্দ্দয়, তুমি এত কঠিন! এত নিষ্ঠুরতা! প্রাণের বেদনা একটু বুঝিলে না! রাণী বলিয়া একটু অনুগ্রহ করিলে না! বিন্দুমাত্র—একটীকণা মমতা কি তথায় ছিল না! এত কি অপরাধ করিয়াছি যে, একবার ফিরিয়াও চাহিলে না?"

কাঁদিয়া কাঁদিয়া যখন লীলার হৃদয়ের আবেগ একটু প্রশমিত হইল, তখন সে মনে

মনে একটা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল। সে আগেই ভাবিয়াছিল, এবার তাহাকে লইতে আসিলে সে শ্বশুরবাড়ী যাইবেই; আর পিতার আপত্তি শুনিবে না। এতদিন লজ্জাবশতঃ কাহাকেও সে কিছু বলে নাই, কিন্তু আর চুপ করিয়া থাকিবেন না। শ্বশুর বারংবার লইতে আসিতেছেন, আর তাহার পিতা বারংবার তাঁহার অপমান করিয়া ফিরাইয়া দিতেছেন! কি অন্যায়! কেন তাঁহারা এরূপ অপমান সহ্য করিবেন? সুধীরের সহিত সে যাইবে, ইহা মনস্থ করিয়াই সে সুধীরকে ডাকিয়াছিল, কিন্তু ক্রোধোন্মত্ত সুধীর তাহার কোনও কথা না শুনিয়াই চলিয়া গেল। লীলা বুঝিয়াছিল, তাহার শ্বশুরকে দরিদ্র বলিয়া পিতা ঘৃণা করেন। কিন্তু সে দোষ কাহার? পিতা সমস্ত জানিয়া স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বিবাহ দিয়াছিলেন। যদি তাঁহার মনে এই সকল ছিল, তবে কেন বিবাহ দিয়াছিলেন? রমণীর পতিই সর্ব্বস্ব! পতিসেবাই নারীর প্রধান ধর্ম্ম! পতি বিনা নারীজীবনে সুখ কোথায়? সেই পতিসেবা হইতে কন্যাকে বঞ্চিত করা কি পিতার উচিত কার্য্য হইতেছে? লীলা ভাবিল, "এই ত তিনি এইখানেই আছেন। অনুনয়-বিনয় করিয়া পত্র লিখিয়া একবার তাঁহাকে আসিতে লিখিব। তিনি আসিলেই তাঁহার সঙ্গে চলিয়া যাইব। তিনি কি একবার আসিবেন না?" এই ভাবিয়া লীলা চক্ষু মুছিয়া পত্র লিখিতে বসিল।

লিখিতে লিখিতে পত্রখানি অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া গেল। সেখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে আবার নূতন কাগজে লিখিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু সেখানিও ঐদশা প্রাপ্ত হইল। সে যতই মনে করে সে আর কাঁদিবে না, ততই তাহার সযত্ন-বারিত রুদ্ধ অশ্রুধারা শত-ধারায় প্রবাহিত হয়। উপর্য্যুপরি কয়েকখানি কাগজ নষ্ট হইবার পর বহুকষ্টে একখানি পত্র সে প্রস্তুত করিল। যাহা মনে আসিল, তাহাই সে লিখিল। সে-পত্রে বর্ণবিন্যাস ছিল না, ভাষার প্রাচুর্য্য ছিল না; ছিল কেবল আসিবার জন্য অনুরোধ, এবং শতেকটা মাথার দিব্য।

ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিতে করিতে কম্পিত-করে লীলা পত্রখানি মুড়িয়া একজন দাসীর হাতে দিয়া, তাহাকে তাহা গোপনে সুধীরের হাতে দিয়া আসিতে বলিয়া দিল।

দাসীটী লীলাকে মানুষ করিয়াছিল; সে লীলাকে বড়ই ভালবাসিত। লীলার কথা মত সে গোপনে পত্রখানি লইয়া চুপি চুপি সুধীরের বাসায় গেল। কিন্তু সেখানে গিয়া সুধীরের দেখা পাইল না। মেসের একটী ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, সুধীর বাড়ী গিয়াছে।

সুধীর বাটী হইতে আসিয়া বরাবর অবিনাশবাবুর বাটী আসিয়াছিল, 'মেসে' যায় নাই। তাই তাহার আগমন-বার্ত্তা 'মেসে'র কেহই জ্ঞাত ছিল না। তাহারা জানিত সুধীর বাটীতেই আছে।

লীলা পত্র প্রেরণ করিয়া কত কি চিন্তা করিতেছিল, এমন সময় দাসী আসিয়া পত্র ফেরত দিয়া বলিল, "জামাইবাবু বাড়ী গেছেন; এখানে নেই।"

লীলা জিজ্ঞাসা করিল, "কবে আস্‌বেন, কিছু শুন্‌লি?"

"না বাবু, তা কিছু শুন্‌লাম না!" বলিয়া দাসী চলিয়া গেল।

লীলা সুধীরের উত্তরীয়খানি বক্ষে চাপিয়া

ধরিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল। অবলা রমণীর কান্না ভিন্ন আর অন্য উপায় কি আছে? কান্নাই নারীর সম্বল, কান্নাই নারীর বন্ধু! কাজেই জীবন-সর্ব্বস্ব তাহার সে কান্না কেহ দেখিল না, কেহ বুঝিল না। দুঃখীর দুঃখের অংশ গ্রহণ করিবার জন্য ধনমত্ত বিলাসীর গৃহে কাহাকেও পাওয়া যায় না। ধনমদে মত্ত যে, দয়া মায়া, সমবেদনা, তাহার গৃহে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই লীলার কান্না কেহ দেখিল না, কেহ বুঝিল না। ধনমত্ত ধনকেই কেবল মাত্র সুখের উপকরণ মনে করে।

লীলা স্বামীর উপর অভিমান করিতে পারিল না। পিতার উপরেই তাহার রাগ হইতে লাগিল। কিন্তু পিতাকে আর কি বলিবে? তাই তাহার অন্তরে যাহা উদয় হইতেছিল, সে তাহাই করিতেছিল। কিরূপে স্বামীর সহিত মিলিত হইবে, সে তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিতেছিল। সে আবার উঠিয়া সুধীরকে পত্র লিখিতে বসিল। এবার পত্র লিখিয়া শিরোনাম লিখিয়া টিকিট আঁটিয়া ডাকঘরে ফেলিয়া দিবার নিমিত্ত ভৃত্যকে আদেশ করিল।

পত্র লিখিয়া উত্তরের আশায় লীলা প্রত্যহ ডাকের মুখ চাহিয়া থাকে। একদিন দুইদিন করিয়া সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল, তবুও লীলার পত্রের উত্তর আসিল না। লীলা গবাক্ষের নিকটে দাঁড়াইয়া, পথের পানে চাহিয়া থাকে। 'পিয়নে'র স্কন্ধবিলম্বিত 'ব্যাগ্'টী দৃষ্টি-পথে পতিত হইবামাত্র তাহার হৃদয় দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠে। যদি কাহারও পত্র লইয়া 'পিয়ন' বাটীর দ্বারে আসিয়া "চিঠ্ঠি" বলিয়া হাঁকিত, লীলা অমনি অস্থির হইয়া উঠিত। ঐ বুঝি তাহার পত্রের উত্তর আসিল! কিন্তু লীলার পত্রের কোনও উত্তর আসিল না।

একখানি একখানি করিয়া লীলা তিন চারিখানি পত্র লিখিল, কিন্তু তাহার কোনও পত্রেরই উত্তর আসিল না। তখন তাহার বড় ভয় হইল। সে ভাবিল, "তবে কি তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন? পিতার অপরাধে আমাকে এ কঠোর শাস্তি দান করিবেন? অহো! অবলার সর্ব্বস্ব-ধন, পতি-পরিত্যক্তা হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিব?"

লীলা যখন এইরূপ চিন্তায় মগ্ন, ও দিকে তখন হরনাথবাবু পুত্রের সংবাদ না পাইয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন। প্রায় মাসাধিক হইল সুধীর লীলাকে লইতে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে লইয়া যাইতে সমর্থ না হওয়ায় সে আর বাটী ফিরে নাই। পুত্রগতপ্রাণ বৃদ্ধ পুত্রের সংবাদের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কলিকাতায় তিনি সুধীরের 'মেসে' সংবাদ জানিলেন। সেখানে তাহারা সুধীরের কোনও খবরই দিতে পারিল না। অবশেষে অবিনাশবাবুর কাছে গিয়া তিনি শুনিলেন, সুধীর তথায় আসিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই দিনই চলিয়া গিয়াছে। হরনাথবাবুর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সুধীর বাটী যায় নাই, কলিকাতায় নাই, তবে সুধীর গেল কোথায়?

লীলা সব শুনিল। তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, শ্বশুরের পায়ে ধরিয়া সে সকল কথা

খুলিয়া বলে; বলে, "ওগো, সে যে বড় অভিমানী! সে যে রাগ করে চলে গেছে! তোমরা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এস গো, ফিরিয়ে নিয়ে এস! লীলার আরাধ্য দেবতাকে তোমরা খুঁজে এনে লীলাকে দাও।" কিন্তু মুখে কোনও কথা সে বলিতে পারিল না। লজ্জা আসিয়া বাধা প্রদান করিল।

(১১)

সুধীরের কোনও সংবাদ না পাওয়াতে অবিনাশবাবুও চিন্তিত হইলেন। সুধীর গেল কোথায়? অবিনাশবাবু "গোড়া কাটিয়া আগায় জল" বিস্তর ঢালিলেন। সুধীরের অনুসন্ধানের জন্য বিস্তর অর্থব্যয় করিলেন, কিন্তু সুধীরের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। প্রথমে তিনি পুলিশে সংবাদ লইলেন। সেখানে সুধীরকুমার রায় অমুক তারিখে নির্দ্দোষ প্রমাণ হইয়া মুক্তিলাভ করিয়াছে, আর তাঁহার নামে কোনও অভিযোগ নাই। সুধীরের বন্ধুবান্ধবের কাছে তিনি জানিলেন। তাহারা কোনও সংবাদই বলিতে পারিল না। পুলিশে ঘোষণা, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন, 'ওয়ারেণ্ট' প্রভৃতি নিরুদ্দিষ্টের উদ্দেশের জন্য যে যে উপায় আছে, তাহার কিছুই করিতে ব্যতিক্রম হইল না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতীত হইয়া গেল, তথাপি সুধীরের কোনও সংবাদ নাই! তখন অবিনাশবাবু স্থির করিলেন যে, সুধীরের মৃত্যু হইয়াছে। সেই যে সুধীর বলিয়াছিল, "মেয়েকে সুখী কর্ত্তে চেষ্টা কর্ব্বেন।"—অবিনাশবাবু ভাবিলেন, সে কথার অর্থ আর কি হইতে পারে? হতভাগ্য যুবক ক্রোধভরে নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিয়াছে। নচেৎ এত অনুসন্ধানে কি তাহার কোনও নিদর্শন পাওয়া যাইত না?

এই ভাবিয়া একদিন তিনি চুপি চুপি গৃহিণীকে বলিলেন, "দেখ, সুধীর ছোঁড়া, বোধ হয়, আত্মহত্যা করেছে। নইলে এতদিনে কোন রকমে না কোন রকমে তার কোনও খবর পাওয়া যেত।"

গৃহিণী এ-কথা শুনিয়াই 'দড়াম্' করিয়া আছাড় খাইয়া গৃহতলে পড়িয়া উচ্চ চিৎকারে পাড়া মাতাইয়া তুলিলেন।—"ওগো, আমার লীলার কি হবে গো! লীলী আমার মাছের মুড়ো নইলে ভাত খেতে পারে না যে গো!—সে দুধের মেয়ে নিরিমিষ্যি ভাত কেমন করে খাবে গো!"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

অবিনাশবাবু কথাটা বলিয়া ফেলিয়া বড় মুস্কিলে পড়িলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল না যে, লীলা এ-কথা জানিতে পারে। তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আঃ!—চুপ কর না, ছাই;—অত চেঁচাচ্ছ কেন? এখুনি লীলী শুনতে পাবে!"

অবিনাশবাবু চুপ করিবার জন্য গৃহিণীকে যতই অনুরোধ করিতে লাগিলেন গৃহিণীর সুর ততই পঞ্চম হইতে সপ্তমে উঠিল! "ওগো আমি কি করে চুপ কোর্ব্বো গো?—আমার লীলী থান পরে বেড়াবে, আমি কেমন করে তা দেখ্‌ব গো! আমি তাকে গয়না খুল্‌তে দোবো না গো!"—ইত্যাদি ইত্যাদি—।

অবিনাশবাবু গৃহিণীকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া, বিরক্ত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অবিনাশবাবুর ইচ্ছা ছিল, সুধীরের

কল্পিত মৃত্যুর কথাটা যেন লীলা জানিতে না পরে। কিন্তু কথাটা লীলার কর্ণগোচর হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। গৃহিণীর কান্না শুনিয়াই মোহিনী দাসী অঞ্চল-দ্বারা চক্ষু রগ্‌ড়াইয়া লাল করিয়া লীলার কাছে গিয়া কাঁদ-কাঁদ-স্বরে বলিল, "আহা দিদিমণি গো কি সর্ব্বনাশটা হ'ল গো! আহা এও পরমেশ্বরের মনে ছিল গো!"

লীলা চমকিত হইয়া ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি!—কি!—কি হয়েছে? অমন কচ্ছিস কেন?"

দাসী। আহা! এও তোমার কপালে ছেল?

কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় লীলার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

দাসী পূর্ব্ববৎ স্বরে বলিল, "আহা আমি সে-কথা কেমন করে মুখে আন্‌ব গো—!"

লীলা ব্যগ্র হইয়া বলিল, "তোর পায়ে পড়ি, মোহিনি, বল্ কি হয়েছে?"

কথাটা বলিবার জন্য মোহিনীর পেট ফুলিয়া দম্ আট্‌কাইতেছিল; কিন্তু কথাটা একেবারে বলিয়া ফেলা উচিত হয় না বলিয়া, বলিতে পারে নাই। লীলার আগ্রহ দেখিয়া সে বলিয়া ফেলিল, "আহা দিদিমণি! জামাইবাবু নেই গো! মা ঠাকরুন্ তোমার নাম ক'রে বুক চাপ্‌ড়ে কাঁদ্‌তে লেগেচে। আহা, তুমি যে বড় আদুরে মেয়ে গো! তোমার এমন দশা তানারা কি করে দেখ্‌বে?"

লীলার মস্তকে বজ্রপাত হইল। এরূপ দুঃসংবাদ শুনিবার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। এমন সংবাদ যে শুনিতে হইবে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। কথাটা শুনিয়া তাহার মাথাটা ঘুরিয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল, বুঝি, তাহার পায়ের নীচে হইতে পৃথিবীটা সরিয়া যাইতেছে। লীলা দাঁড়াইয়াছিল; মাথায় হাত দিয়া ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। তাহার চক্ষু হইতে একবিন্দু অশ্রু নির্গত হইল না; হৃদয় ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও বহিল না। কেবলমাত্র মুখখানি পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল! সে নির্ব্বাক্, নিশ্চল জড়পিণ্ডের ন্যায় বসিয়া রহিল। তাহার ভাব দেখিয়া মোহিনী ভীত হইয়া চলিয়া গেল।

কিছু পরে আর একজন দাসী আসিয়া বলিল, "আহা! এমন লক্ষ্মী মেয়ের কপালে এই ছিল গা! এই কচি বয়সে পোড়া কপাল পুড়্‌ল! হ্যাঁ দিদিমণি! জামাইবাবুর কি হয়ে ছেলো গা?"

লীলা কোনও উত্তর করিল না। উত্তর দিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না। তাহার অন্তরমধ্যে যে কি হইতেছিল, তাহা সেই জানে। অন্যে তাহা কি বুঝিবে?

গৃহিণী যখন জানিলেন যে, কথাটা লীলার অগোচর নাই, তখন তিনি মনে করিলেন, তবে আর লুকাইয়া কি হইবে? তিনি লীলার নিকটে আসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবার মানসে বলিলেন, "শুনেছ ত মা, জামাই মারা গেছেন। তা'র জন্যে তুমি মনে কোনো কষ্ট কোরো না! বিয়ে হয়েছিল ঐ পর্য্যন্ত,—কেবল আইবুড় নাম ঘুচেছিল বৈ ত নয়! শ্বশুর-বাড়ীর সুখ ত আর পাও নি! তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাক; আমি তোমার কোনো কষ্ট রাখ্‌ব না। তোমাকে এক সুট জড়োয়ার গয়না গড়িয়ে দোব, হাতীবাগানের

বাড়ীখানা তোমার নামে লিখে দোব। তোমার কিসের ভাবনা?"

লীলা মাতাপিতার এরূপ মমতাশূন্য রূঢ় কথা অনেক শুনিয়াছিল, অনেক সহ্যও করিয়াছিল। এবার সে সহ্য করিবার সীমা অতিক্রম করিল। নারীর সর্ব্বস্বধন স্বামী নাই, আর মাতা সেই কথা নিরুদ্বেগে বলিতেছেন! অর্থের লোভ দেখাইতেছেন! থাকুন্ তিনি তাঁহার অর্থ লইয়া। লীলা তাঁহার অর্থের প্রয়াসিনী নয়। লীলা বিরক্ত হইয়া বলিল, "যাও মা, আর আমাকে জ্বালাতন কোরো না। তোমরাই আমাকে শ্বশুর বাড়ীর সুখে বঞ্চিত করেছ। আজ কি ছার অর্থের লোভ দেখাতে এসেছ! আমি তোমার অর্থের কাঙ্গালিনী নই।"

লীলার মুখে এ রকম কথা শুনিয়া মাতা আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। যে লীলা মুখ ফুটিয়া কখন একটী কথা বলে না বা বলিতে সাহস করে না, তার মুখে আজ এমন কথা! তিনিও রাগে গর্‌গর্ করিতে করিতে, চলিয়া গেলেন।

লীলা আপনার কক্ষে গিয়া সুধীরের সেই পরিত্যক্ত উত্তরীয়খানি বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া রোদন করিতে লাগিল! "—কোথায় তুমি দুঃখিনীর আরাধ্য দেবতা! এস, একবার এস! 'তুমি নেই'—এ কথা যে প্রাণে সহ্য হয় না! কে বলে তুমি নাই? না, না, তুমি আছ। আমি ত এমন কোনও পাপ করি নি যাতে বিধাতা আমার সিঁথির সিঁদুর মুছে দেবেন্! আমি তোমার পায়ে এমন কি অপরাধ করেছি যে, তুমি আমাকে পরিত্যাগ ক'রে যাবে! তুমি কি জান না আমার হৃদয় তোমার প্রতিমূর্ত্তিতে পূর্ণ! তোমার ধ্যানে আমি মগ্ন! তোমার চরণ ভিন্ন আমি ত কিছুই জানি না। আমার এ সাধনা কি সিদ্ধিলাভ কর্ব্বে না? এ তপস্যা কি নিষ্ফল হবে? না, না, তা কখন হবে না। নারায়ণ সতীর সহায়। জীবনসর্ব্বস্ব! তুমি যেখানেই থাক, আমি তোমাকে খুঁজে বা'র কোর্ব্বোই। তুমি যে দেশে যেখানেই থাক, আমি তোমার কাছে যাবই। তোমার চরণ ভিন্ন আমি ত কিছুই জানি না। তবে কেন আমি তোমার চরণদর্শনে বঞ্চিত হব?"

(১২)

কত বৎসর চলিয়া গেল! সুধীর আসিল না। অবিনাশবাবুর বাটীর সকলে সুধীরের নাম বিস্মৃত হইল; কেবল একজন হইল না। সুধীরের কথা, সুধীরের নাম লীলার জপমালা হইল। সুধীর কবে তাহাকে কোন্ মিষ্ট কথাটি বলিয়াছিল, কবে তাহাকে আদর করিয়াছিল, কবে তাহাকে দেখিবার জন্য লুকাইয়া আসিয়াছিল, সেই সকল ভাবিয়াই সে দিন যাপন করে। লীলা আহার-বিহার, বেশভূষা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছিল; কেবল সধবার চিহ্ন শাঁখা-সিঁদুর ত্যাগ করে নাই। তাহার মনের দৃঢ় বিশ্বাস, সুধীর বাঁচিয়া আছেই; এ-সকল ত্যাগ করিলে স্বামীর অমঙ্গল হইবে। তাই সে এ-সকল ত্যাগ করে নাই। সে অধিকাংশ সময় নিজের কক্ষেই অবস্থান করিত। বাহিরের বাতাস, লোকের কলরব তাহার বিষাক্ত বলিয়া মনে হইত। কোথাও নিমন্ত্রণে বা বেড়াইতে যাওয়া সে একেবারে ত্যাগ করিয়াছিল। পিতার এ সুখভবন তাহার কারাগৃহ বলিয়া অনুভূত হইত। লীলা

ভাবিত, 'বাবা বুদ্ধিমান্ হয়ে কেন এমন কাজ করলেন? কেন তাঁকে এমন কথা বল্লেন? যখন তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছেন, তখন ত আমি তাঁরই। তিনি যেখানে থাক্‌বেন সেই আমার অমরাবতী। তিনি মেটে ঘরে বাস করেন;—আর আমি তাঁর দাসী! আমি কি সে ঘরে বাস কর্‌তে পারতুম্ না? তাঁর দাসী নাই? নাই বা থাক্‌ল? আমি কি তাঁর কাজ নিজের হাতে কর্‌তে পারতুম না? ঐ ত হরিদাসী, মোহিনী বাসন মাজে!—ওরাও মানুষ আমিও মানুষ, আমি কি আর বাসন মাজতে পারতুম্ না? আর রান্না?—সেটাত গৃহস্থমাত্রেই করে। হায়, আমি নিজের হাতে রেঁধে স্বামীকে শ্বশুরকে খাইয়ে কত সুখ পেতুম! হায়! কেন বাবা আমাকে সে সুখে বঞ্চিত কর্‌লেন? রান্না, সকলকে খাওয়ান, এত মেয়ে মানুষের প্রধান ও প্রথম তৃপ্তিপ্রদ কাজ! লোকে মিছেমিছি কতগুলো রাধুনী রেখে কত অর্থনষ্ট ও অতৃপ্তির উৎপাদন করে! সে অর্থে কাঙ্গাল গরিবদের খাওয়ালে তাদের জীবনরক্ষা হয়। কেন তারা করে না? সুখী লোকে, বুঝি, দুঃখীর দুঃখ বুঝে না!' (ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

সুখ-তৃষা।

তোমারে স্মরণ হ'লে
জাগে প্রাণে অনুতাপ!—
জনমি দুনিয়া 'পরে
করিয়াছি কত পাপ!
এ চিত্তের অবসাদ
ঘুচে যায় তব গানে!
কোথা হ'তে কুড়াইয়ে
তপ্ত প্রাণে শান্তি আনে!
সংসার-বাঁধনে আমি
সদা জড়াইয়ে আছি!
অটুট বাঁধন তাই,
হ'তে নারি কাছাকাছি!
যবে গো বিষাদ-মাঝে
নিরিবিলি থাকি বসে,
তখনি তোমার স্মৃতি
আঁখি-পথে আসে ভেসে!
তখনি গো উঠি কেঁদে,
তখনি গো তোমা চাই!
তখনি তোমার পদে
প্রাণ-ভয়ে মাগি ঠাঁই!
তখনি ভকতি আসে
করিবারে আবাহন!
কিন্তু কতটুকু সখা,
তোমা সনে আলাপন?
আকুল আবেগ ভরে
চাহি ঐহিকের সুখ।
কিছু না বুঝায়ে তুমি
দিলে মোরে সেই টুক্!
সেই যে তোমার সনে
হ'লো মোর পরিচয়;
আর না হইল; তুমি
পলাইলে দয়াময়!

চাহি ঐহিকের সুখ,
তুমি হলে নিরদয়;
ডুবিনু বিষয়-কূপে,
ভকতির হলো লয়!

সম্পদে গলাও তুমি,
মোর দুখে হলো ভুল!
বোঝালে না প্রভু তুমি,
আমি গো কাটিনু মূল!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

নবদ্বীপ।

নবদ্বীপ বঙ্গদেশের অন্তঃপাতী নদীয়া-জেলার পুরাতন রাজধানী। ইহা ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। এ-স্থানের লোক-সংখ্যা ১০৮৮০; তন্মধ্যে ১০৪১৬ জন হিন্দু, ৪৫৭ জন মুসলমান এবং ৭জন খৃষ্টান। বঙ্গদেশের রাজা বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে নবদ্বীপ-রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। ১২০৩ খৃঃ মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক সহরটী অধিকৃত হয়। এস্থানে সংস্কৃত-সাহিত্যের চর্চ্চা বহুল পরিমাণে হইয়া থাকে বলিয়া স্থানটী ভারতের মধ্যে প্রসিদ্ধ। হিন্দুধর্ম্ম-সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, নবদ্বীপের পণ্ডিতদিগের মীমাংসাই গৃহীত হইয়া থাকে। বহু পুরাকাল হইতে হিন্দু-রাজগণ এস্থানে সংস্কৃত-শিক্ষার জন্য অনন্ত উৎসাহ দিয়া আসিয়াছেন বলিয়াই এস্থানে সংস্কৃত চর্চ্চা এত অধিক। হাজার হাজার ছাত্র এখানে হিন্দুদর্শন শিক্ষা করিয়া থাকে। এস্থানের বহু ছাত্রই ভারতে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। অত্যন্ত প্রসিদ্ধ কয়েকটীর নাম—হলায়ুধ, পশুপতি, শূলপাণি এবং উদয়নাচার্য্য। ইঁহারা সকলেই লক্ষ্মণ সিংহের সমসাময়িক; অব্ধিবোধ যোগী নামে জনৈক পণ্ডিত হিন্দুস্থান হইতে সমাগত হইয়া নবদ্বীপে প্রথম তর্কশাস্ত্রের বিদ্যালয় স্থাপন করেন। নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম মিথিলার পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র। তর্কশাস্ত্র ইহার কণ্ঠস্থ ছিল। রঘুনাথ শিরোমণি, রঘুনন্দন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ এবং গৌরাঙ্গ দেব ইহার বিখ্যাত ছাত্র। রঘুনাথ শিরোমণি দীধিতি ও গৌতম-সূত্রের টীকা প্রণয়ন করেন। রঘুনন্দন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য স্মৃতিতে ও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তন্ত্রে খ্যাতিলাভ করেন। গৌরাঙ্গ বা চৈতন্য-দেব বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সংস্কারক হ'ন। চৈতন্য জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র। তিনি ১৪৮৪ খৃঃ নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। এজন্য বৈষ্ণব-গণের নিকট নবদ্বীপ পরম পবিত্র স্থান।

বর্ত্তমান নবদ্বীপও সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বিখ্যাত। সংস্কৃত বিদ্যালয়ের নাম টোল। তথায় স্মৃতি ও ন্যায় শিক্ষা দেওয়া হয়। বেতন লইয়া বিদ্যাশিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি টোলে নাই; বরং পণ্ডিতেরা ছাত্রগণকে গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া থাকেন। মহারাজ-কৃষ্ণচন্দ্র টোল রাখিবার জন্য একশত টাকা মাসিক বৃত্তি দিতেন। তদবধি ঐ টাকা এখনও দেওয়া হইতেছে। এতদ্ব্যতীত ইংরাজ গভর্ণমেণ্টও ১০০৲ টাকা ন্যায়ের প্রথম এবং ৬০৲ টাকা দ্বিতীয় এবং

৫০৲ টাকা স্মৃতির অধ্যাপককে দিয়া থাকেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া এখানে একজন উত্তর-পশ্চিম-দেশস্থ পণ্ডিত দর্শন ও বেদান্ত শিক্ষা দিতেছেন। পূর্ব্বে নবদ্বীপের পঞ্জিকার বিলক্ষণ সমাদর ছিল। তাহাতে ঝড়বৃষ্টির যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী থাকিত, লোকে তাহা অভ্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করিত। দুঃখের বিষয় এই যে, জ্যোতিষের আচার্য্য এখন বিলোপোন্মুখ হইয়াছে।

চৈতন্যদেবের জন্মস্থানে বৈষ্ণবগণ প্রতি-বৎসর সমাগত হ'ন এবং বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘী পূর্ণিমাতে তথায় মেলা হইয়া থাকে।

নদীর পূর্ব্বতটে বর্ত্তমান নবদ্বীপের বিপরীতে বামনপুকুর নামে একটী গ্রাম আছে। তথায় অনেকগুলি ঢিবি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা বল্লাল-ঢিবি নামে খ্যাত। এই স্থানে বল্লাল সেনের রাজভবন ছিল। স্থানটীতে বল্লাল-দীঘি নামে একটী সরোবরও আছে। এগুলির অস্তিত্বে ইহাই অনুমিত হইয়া থাকে যে, বল্লাল সেন যেমন গৌড়ে বাস করিতেন, তেমনই তিনি এখানেও বাস করিতেন।

কলিকাতা অপেক্ষা নবদ্বীপের জল-হাওয়া অনেক পরিমাণে ভাল। পূর্ব্বে শরীর অসুস্থ হইলে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা এখানে শরীর সুস্থ করিতে আসিতেন।

নবদ্বীপে পিত্তল-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বক্রেশ্বর।

বক্রেশ্বর বঙ্গদেশস্থ বীরভূম-জেলার একটী গ্রামমাত্র। ইহা বক্রেশ্বর-নদীর উপর অবস্থিত। এখানে দেব-মন্দিরের মধ্যে শিবের মন্দিরই অধিক। বক্রেশ্বর একটী পীঠস্থান। সতীর কপালদেশ এখানে পতিত হইয়াছিল। এইজন্য প্রতিবৎসর অনেক যাত্রী এস্থানে তীর্থ করিতে আসেন।

এইস্থানের আখ্যায়িকা এইরূপ :—একদা সুবৃত ও লোমশ ঋষি লক্ষ্মীর স্বয়ম্বরে নিমন্ত্রিত হইয়া স্বয়ম্বর-স্থলে উপস্থিত হইলে, লোকেরা পূর্ব্বে লোমশ ঋষির অভ্যর্থনা করে। তাহা দেখিয়া সুবৃত ঋষি ক্রোধ সহ্য করিতে না পারিয়া অবিলম্বে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া যান্। এই সময়ে তাঁহার ক্রোধ এরূপ সীমায় পঁহুছিয়াছিল যে, তৎ-প্রভাবে তাঁহার শরীরের অষ্টস্থান বক্র হইয়া গেল। তদবধি তিনি অষ্টাবক্র নামে খ্যাত হইলেন। অঙ্গবিকৃতি সঙ্ঘটিত হইলে তিনি অতিদুঃখিতান্তঃকরণে কাশীতে শিবের আরাধনার জন্য সমাগত হন। এখানে তাঁহার প্রতি দেবাদেশ হয় যে, যতক্ষণ তিনি বঙ্গদেশের গৌড়-নামক স্থানের গুপ্ত কাশীতে আরাধনা না করিবেন, ততক্ষণ তিনি সফল কাম হইবেন না। অষ্টাবক্র ঋষি বক্রেশ্বরে আসিয়া দশ হাজার বৎসর ব্যাপিয়া শিবের আরাধনা করেন। তখন মহাদেব সদয় হইয়া এই বর দেন যে, এখানে পূর্ব্বে যে অষ্টাবক্রের ও পরে মহাদেবের পূজা করিবে তাহার অক্ষয় পুণ্য সঞ্চিত হইবে। অষ্টাবক্র যেখানে তপস্যা করিয়াছিলেন, সেখানে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিবার জন্য বিশ্বকর্ম্মা আদিষ্ট হন্। তাঁহার উপর ইহাও আদেশ ছিল যে, মন্দির প্রস্তুত হইলে, তন্মধ্যে দুইটী মূর্ত্তি থাকিবে ;—একটি অষ্টাবক্রের ও অন্যটী মহাদেবের। এখন মন্দিরের মধ্যে যে দুইটি

মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে বৃহৎটী অষ্টাবক্রের।

বিশ্বকর্ম্মা যেখানে মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাহার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে। বর্ত্তমান মন্দিরের মধ্যে কোনও উৎকীর্ণ-লিপি নাই। উত্তর-পূর্ব্বদিকে বহির্দ্বারের উপর ত্রিকোণাকৃতি স্থানে যে লেখা দেখা যায়, তাহাতে ইহাই বুঝায় যে শালিবাহন শকে (১৬৮৩) দর্পনারায়ণ নামে জনৈক ব্যক্তিদ্বারা মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে ভিতর ভাগে প্রোথিত দুইটী প্রস্তরের হেতম্বর ও তরলাসার ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম এবং তৃতীয় প্রস্তরটীতে শালিবাহন শক (১৬৭৭) খোদিত আছে। এখানে অনেকগুলি রাস্তা ও গলি দৃষ্ট হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কেবলমাত্র মহাদেবের মূর্ত্তিই দেখা যায়। মূর্ত্তিগুলি অবশ্য সমৃদ্ধ ব্যক্তিগণ তীর্থ করিতে আসিয়া স্থাপিত করিয়াছেন। দক্ষিণ-পশ্চিমে তিনটী পুষ্করিণী আছে। সেগুলি সালকাটালি, চন্দ্রসাইর এবং দামুসাইর নামে খ্যাত। এখানে যে ব্রাহ্মণ তীর্থকৃত্যাদি করান, তিনি বলেন যে, উক্ত নামের ভদ্রব্যক্তি দ্বারা পুষ্করিণী খোদিত হইয়াছে।

দক্ষিণে একটি প্রস্রবণ অবস্থিত। সেখানকার জল উষ্ণ। অনেকগুলি বাটীও সেখানে দৃষ্ট হয়। প্রস্রবণ হইতে গন্ধকের ধূমরাশি সদাই উদ্গীর্ণ হইতেছে। এরূপ প্রস্রবণের সংখ্যা আটটী। তন্মধ্যে যেটী অত্যন্ত উষ্ণ তাহা অগ্নিকুণ্ড-নামে খ্যাত। এখানকার জলের উষ্ণতা প্রায় ২০০° ডিগ্রি। সিঁড়িদ্বারা স্নাতকগণ কুণ্ডে অবতরণ করে। এই জলে সর্প ও ভেক বহুল পরিমাণে মরিয়া থাকে। সেগুলিকে পরিষ্কার করিয়া জলে নামিতে হয়। জলটী উষ্ণ ও গন্ধকের ঘ্রাণবিশিষ্ট। সুতরাং ইহা কোনও বিশেষ রোগের উপশম করিতে সমর্থ। এখানকার প্রবাদ এই যে, শিব হতরাক্ষ পাতালে বাস করেন। তাঁহার মস্তকে সুমেরু পর্ব্বত অবস্থিত। শিবের তেজে জলটী উষ্ণ হইয়া পৃথ্বীগর্ভ হইতে নিঃসৃত হইতেছে।

প্রত্যেক প্রস্রবণের এক একটী আখ্যায়িকা আছে। অগ্নিকুণ্ড-সম্বন্ধে প্রবাদ এইরূপ যে, রাজা হিরণ্যকশ্যপ কৃষ্ণদ্বেষী ছিলেন। তাঁহার পুত্র প্রহ্লাদ কিন্তু কৃষ্ণভক্ত। এজন্য তাঁহাকে অনেক কষ্ট ভুগিতে হয়। অবশেষে হিরণ্যকশ্যপের নির্য্যাতন হইতে প্রহ্লাদকে রক্ষা করিবার জন্য কৃষ্ণ হিরণ্যকশ্যপকে বধ করেন। প্রহ্লাদ আপনাকে পিতৃবধের হেতু ভাবিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে স্বীয় পাপক্ষালনার্থ তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বক্রেশ্বরে আগমনপূর্ব্বক উক্ত কুণ্ডে স্নাত হইয়া শিবের আরাধনায় বিগতকল্মষ হয়েন। এই জন্য অগ্নিকুণ্ডের এত মাহাত্ম্য।

ব্রহ্মকুণ্ড-সম্বন্ধে প্রবাদ এইরূপ যে, ব্রহ্মা স্বীয় কন্যাকে কামদৃষ্টিতে অবলোকন করিলে মহাদেব-কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হন্। তখন তিনি স্বীয় পাপ-ক্ষালনার্থ ও শিবকে পরিতুষ্ট করিবার মানসে বক্রেশ্বরে সমাগত হইয়া ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করতঃ মহাদেবের আরাধনায় পাপমুক্ত হন।

শ্বেতগঙ্গার প্রবাদ এই যে, বর্দ্ধমান জেলাস্থ মঙ্গলকোটের শ্বেতনামক জনৈক রাজা মহাদেবের আরাধনা করেন। শিব পরিতুষ্ট হইয়া বর দিতে উদ্যত হইলে, তিনি এইবার প্রার্থনা

করেন যে কুণ্ডটী তাঁহার নামে প্রসিদ্ধ হইবে। মহাদেব 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

সানভাগ্যকুণ্ডের প্রবাদ এইরূপ যে, হিমালয়ের কন্যা গৌরী মহাদেবের জন্য লালায়িত হইয়া বক্রেশ্বরে আগমনপূর্ব্বক উক্ত কুণ্ডে স্নানকরণান্তর মহাদেবের তপস্যা করেন। মহাদেব তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হন্ ও পরে উভয়ের বিবাহ হিমালয়ে হয়।

সূর্য্যকুণ্ড-সম্বন্ধে প্রবাদ এইরূপ যে, একদা নারদ ঋষি ভ্রমণ করিতে করিতে বিন্ধ্য-পর্ব্বতে সমাগত হইয়া সুমেরু পর্ব্বতের গুণগান করিতে লাগিলেন। সুমেরুর-গুণগাণ বিন্ধ্যের অসহ্য হইল। তখন তিনি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া সূর্য্যের গতিরোধ করিলেন। সূর্য্য দুঃখিতান্তঃকরণে এখানে আসিয়া উক্তকুণ্ডে স্নানপূর্ব্বক মহাদেবের আরাধনা করেন। মহাদেব তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া বিন্ধ্যকে অবনত করিবার উপায় উদ্ভাবন করেন।

জীবনকুণ্ডের প্রবাদ এই :—পূর্ব্বকালে সরভ ও চারুমতি নামে দম্পতী বাস করিত। তাঁহারা ধার্ম্মিক ছিলেন। সংসারে তাঁহাদিগের আপনার বলিতে আর কেহ না থাকাতে, তাঁহারা উভয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তাঁহারা তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইলে কালবশে ব্যাঘ্র আসিয়া সরভকে হত্যা করে ও তাঁহার দেহের অর্দ্ধেক মাংস খাইয়া ফেলে। চারুমতি অতিদুঃখে শিবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন্। শিব পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিলে,তিনি স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত দেখিতে প্রার্থনা করেন। তখন তাহার প্রতি আদেশ হয় যে, তুমি তোমার স্বামীর অস্থিগুলিকে একত্র করিয়া বক্রেশ্বরে গমন করতঃ জীবনকুণ্ডে অস্থিগুলিকে নিমজ্জিত কর, তবেই তোমার স্বামী জীবিত হইবে। চারুমতি তাহাই করিল। তখন তাঁহার স্বামীও পুনর্জ্জীবিত হইলেন। এখনও অনেক রমণী স্বামীহীন হইলে স্বামীকে সঞ্জীবিত করিবার আশায় জীবনকুণ্ডে স্নান করে।

ভৈরবকুণ্ডের প্রবাদ এইরূপ :—ব্রহ্মা ও মহাদেবের পাচটী মুখ। তখন ব্রহ্মা ভাবিলেন যে তিনি নিশ্চয়ই শিবের সমকক্ষ। ব্রহ্মার প্রতিযোগিতায় শিব ক্রোধান্বিত হইয়া জটা হইতে একটী কেশ উৎপাটিত করিলেন। অমনি বটুক-ভৈরবের আবির্ভাব হইল। তখন শিব বটুক ভৈরবকে ব্রহ্মার ঊর্দ্ধমুখটী নখদ্বারা ছিন্ন করিতে আদেশ দিলেন। আদেশ কার্য্যে পরিণত হইল; কিন্তু ব্রহ্মার ছিন্ন মস্তকটী বটুক-ভৈরবের নখে লাগিয়া গেল। তিনি সর্ব্বতীর্থে ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই মুণ্ডটী তাহার নখ হইতে অপসৃত হইল না। তখন তিনি দুঃখিতান্তঃকরণে কাশীতে সমাগত হইয়া শিবের আরাধনা করিলে, মুণ্ডটী নখ হইতে মুক্ত হইল বটে, কিন্তু তাহার ক্ষত-যন্ত্রণা গেল না। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ভৈরব পুনরায় তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইল। এইবার সে বক্রেশ্বরে আসিয়া ভৈরবকুণ্ডে স্নান ও পাপহরা নদীতে হস্ত ধৌত করাতে তাহার ক্ষত আরোগ্য হইল। ভৈরবকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে পাপহরা নদী অবস্থিত।

খরকুণ্ডের প্রবাদ :—সত্যযুগে মহর্ষি অগস্ত্য সাগরকে উদরস্থ করেন, কিন্তু তাঁহার উদরের জল কিছুতেই বহির্গত হইল না। তখন তিনি বক্রেশ্বরে সমাগত হইয়া খরকুণ্ডে

স্নান করাইয়া শিবের পূজা করিলে, তাঁহার উদরের জল বহির্গত হইল।

বক্রেশ্বরের পূজার জন্য ২৫ জন পাণ্ডা আছে। এখানে বৎসরে একটী করিয়া বৃহৎ মেলা হয়। ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রির পূর্ব্বদিন হইতে মেলা আরম্ভ হয় ও তাহা প্রায় সাতদিন থাকে। এই মেলায় বিক্রয়ার্থ কাটোয়া হইতে কলা, পিত্তলের বাসন ও কলিকাতা হইতে মনোহারী দ্রব্য এবং বর্দ্ধমান জেলার পাটাকোনা নামক স্থান হইতে প্রস্তর নির্ম্মিত দ্রব্যাদি আসে।

বক্রেশ্বরের কুণ্ডের জলে পুরাতন কাশি আরোগ্য হয়। ইহা চর্ম্মরোগাপহ বলিয়া প্রসিদ্ধ। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

গঙ্গা-বন্দনা।

কোথা গো মা, হে জাহ্নবি! এ অধমা
চায় স্থান!
এসেছি, মা, বড় আশে তোমাকে
সঁপিতে প্রাণ!
কুলুকুলু-কুলু-রবে কোথায় তুমি মা যাও!
পায়ে ধরি, মহাদেবি, আমাকে গো
কোলে লও!
পতিতে দাও মা, স্থান, নাম তাই সুরধুনী!
পরমারাধ্যা তুমি,—পুরাণে মহিমা শুনি!

স্মরিলে তোমার নাম, মহাপাপ কেটে যায়;
দাও মোরে কোলে স্থান, রাখ মোরে
রাঙাপায়।
স্রোত মাঝে বেয়ে যায় পাল-তোলা কত তরী,
দিই স্রোতে ভাসাইয়া আমার এ দেহ-তরী!
বহিছে তোমার বুকে প্রবল তরঙ্গ কত!
সতত দেখিতে সাধ তব পদ-কোকনদ!
শুভ্র কুসুমের মত তোমার ও মূর্ত্তিখানি!
সতত বন্দি, মা, তোরে আমার আরাধ্যা জ্ঞানি!

শ্রীনির্ম্মলা রায়।

জাতীয় উন্নতিতে ব্যক্তিগত দায়িত্ব।

অনেকে মনে করেন, ছলে বলে কৌশলে বা শারীরিক বীরত্বে অন্যের রাজ্য কাড়িয়া লইতে পারিলেই জাতীয় উন্নতি হয়। কিন্তু তা নয় না। যদিও হয়, তাহা চিরস্থায়ী হয় না। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে মহাবীর নেপোলিয়ন যেরকম রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, সে সব রাজ্যের জাতিরা সকলেই উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইত। চরিত্রের বল, ধর্ম্ম-নীতির শক্তি, সত্যের প্রভাব যে জাতির উন্নতির ভিত্তিভূমি, অতীতকালের মহত্ত্বের অনুকরণ যে জাতির উন্নতির পরম সহায়, সে-জাতির উন্নতি বিশ্বজগতের ক্রমবিকাশের

নিয়মানুসারে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে বিকশিত হইলেও চির অপ্রতিহত, অপরাজিত ও চির সম্মানিত থাকিবেই; সন্দেহ নাই। গ্রীস ও রোম যখনই বিলাসিতায় উন্মত্ত হইয়া সভ্যতা হইতে বিচ্যুত হইতে লাগিল, তখনই অধঃপতনের মুখে পতিত হইতে আরম্ভ করিল! যখনই পুণ্যময় ভারতের চির-ধর্ম্মশীল জাতির কয়েক ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতক তার মহাপাপ-পঙ্কে নিপতিত হইল, যখনই অতীতকালের মহত্ত্ব ভুলিয়া সুচরিত্র, ধর্ম্মনীতি ও সত্য হইতে স্খলিত হইতে লাগিল, তখনই জাতীয় অবনতির চিহ্ন সকল দেখা যাইতে লাগিল। যদি কোনও জাতিকে উন্নত হইতে হয়, তাহা হইলে সেই জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিকে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান্ হইতে হইবে। যেমন প্রত্যেক অঙ্গের সুস্থতাই স্বাস্থ্যের লক্ষণ, তেমনি প্রত্যেক জাতির প্রতি-ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সুস্থতা ও সজীবতাই জাতীয় উন্নতি, জাতীয় সুস্থতা ও জাতীয় জীবনের লক্ষণ।

নরনারীগণের মধ্যে অনেকে মনে করেন, 'আমি দীন হীন অতিক্ষুদ্র; আমার জ্ঞান নাই, বিদ্যা নাই, সৎকর্ম্মের ক্ষমতা নাই; আমার সঙ্গে জাতীয় উন্নতির কি সম্পর্ক! আমি নীচ, স্বার্থপর ও চরিত্রহীন হইলেও, বোধ হয়, জাতীয় উন্নতির কিছু আসে যায় না! কোথায় দেশদেশান্তর-ব্যাপী একটি জাতি!—তাহার মধ্যে আবার অসংখ্য প্রকৃতি, বর্ণনাতীত চরিত্র, গণনাতীত ধর্ম্ম এবং নীতি বিদ্যমান! এই বিপুল বিস্তৃতি, এই অপরিমেয় ধর্ম্মনীতি-চরিত্র এবং প্রকৃতির মধ্যে আমি কোথায়! আমি আমাকে ত খুঁজিয়াই পাই না! সেই আমি মন্দ হইলেও, চরিত্রগঠন করিতে না পারিলেও জাতীয় উন্নতির ক্ষতিবৃদ্ধি কি?' এরূপ যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের বিষম ভ্রম! একটী জাতিকে সুগঠিত, সুসংযুক্ত ও উন্নত্যোন্মুখ করিতে হইলে, সেই জাতির প্রত্যেক ব্যক্তি সে-জন্য দায়ী! কারণ, একটী বৃহৎ অট্টালিকার নির্ম্মাণকালে যদি একটী ইষ্টক বা প্রস্তর মন্দ থাকে, তাহাতে অলক্ষিত ভাবে সমস্ত অট্টালিকার ক্ষতি হয়। যদি একটী সুরম্য সুসজ্জিত প্রাসাদের কোনও এক অলক্ষিত স্থানে পূতিগন্ধময় কোন পদার্থ সঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে সমস্ত প্রাসাদের বায়ু দূষিত হয়। যদি কোনও প্রকাণ্ড সতেজ মহীরুহে দুইচারিটী কীটাণু কোনও ক্রমে প্রবেশ করে, তবে তাহারা ক্রমে ক্রমে তাহাকে শুষ্ক-কাষ্ঠাবশেষ করিয়া তোলে। যদি কোন সবল সুকান্তি শরীরে দুইএকটী মারাত্মক কীটাণু কোনও ক্রমে প্রবিষ্ট হয়, ক্রমে সে শরীর দুর্ব্বল ও কান্তিবিহীন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এজন্য ভারতবর্ষীয় জাতিকে যদি উন্নত করিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক ভারতীয় নরনারীর কর্ত্তব্য :—নিজ নিজ চরিত্র গঠন করা। ধর্ম্মেতে নীতিতে, সুকর্ম্মেতে, জ্ঞানেতে নিজ-নিজ চরিত্রকে, জীবনব্যাপী প্রকৃতিকে সুসজ্জিত, সমলঙ্কৃত ও জ্যোতিষ্মান্ করিতে চেষ্টা করা। মেধা, জ্ঞান ও অবস্থানুসারে সকলেরই ইহা চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আমি, তুমি, তিনি বা সে লইয়াই জাতি; জাতির অর্থ অন্য কিছু নয়। যেমন একটী একটী অণু লইয়া সমগ্র জড় জগৎ, একটী একটী জলকণা লইয়া মহাসমুদ্র, একটী একটী বৃক্ষ লইয়া মহারণ্য, একটী

একটী বালুকণা লইয়া মহা মরুভূমি তদ্রূপ একটী একটী মানবকে লইয়া সমগ্র মানব-জাতি। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে আবার হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ প্রভৃতি নানাপ্রকার জাতি। জাতির মধ্যে কোনও পুরুষ যদি অসৎপথে পদার্পণ করিয়া অধঃপতনের মুখে পতিত হয়, তাহা হইলে সেই জাতির সকল পুরুষেরই মস্তক অবনত হওয়া কর্ত্তব্য; এবং নারীগণের মধ্যেও সেই প্রকার হওয়া উচিত। সকলেই জানেন, আমাদের প্রাচীন পিতা-মহীগণ বলিতেন, 'এক মেয়ের লজ্জা নয়, সহস্র মেয়ের লজ্জা।' সকলে মিলিয়া নিন্দার বাজার না খুলিয়া, যাহাতে সেই অধঃপতিত ভাই কিম্বা ভগিনী অধঃপতনের মুখ হইতে ফিরিয়া আসেন, তাহাই করা কর্ত্তব্য। কারণ, জাতীয় উন্নতিকল্পে প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব। যদি কেহ উদাসীনভাবে জীবন কাটান, কোনও উন্নতির চেষ্টা না করেন, তাঁহাকেও উত্তেজিত করিয়া, যাহাতে তিনি সকল প্রকার উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, সে বিষয়ে সকলের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কি পরিবার, কি সমাজ, কি জাতি, সকলের পরস্পরের উন্নতির চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জাতীয় উন্নতিকল্পে প্রত্যেক ব্যক্তিরই দায়িত্ব আছে।

জাতীয় উন্নতির জন্য যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার ধর্ম্ম, নীতি, জ্ঞান ও সচ-রিত্রের জন্য দায়ী, তেমনি সে নূতন ও পুরাতনের সংমিশ্রণে জীবনকে উন্নত, শ্রেষ্ঠ, সমুন্নত ও আদর্শস্থানীয় করিবার জন্যও দায়ী! এই ভারতবর্ষীয় জাতি-সকলকে যদি উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখাইতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক ভারতীয় নরনারীকে যেমন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, ও সভ্যতায় উন্নত হইতে হইবে, তেমনি প্রাচীন কালের ভারতীয় উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিগণের যে-সব বিষয়ে সারত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব ছিল, সেই সব বিষয়ের অনুকরণ করিতে হইবে। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ও দৃঢ়তা, রামচন্দ্রের বীরত্ব ও সত্য-পালন, হরিশ্চন্দ্রের প্রতিজ্ঞা ও সত্য-রক্ষা, যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং জনকের ন্যায় সংসারী হইয়াও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। প্রত্যেক ভারতীয় নারীকেও ভারতের পুরাকালীন উচ্চশ্রেণীর নারীগণের গুণাবলীর অনুকরণ করিতে হইবে। সীতার, সাবিত্রীর, দময়ন্তীর সতীত্ব, পাতিব্রত্য, ও সুনীতি; পদ্মাবতী প্রভৃতির ন্যায় ধৈর্য্য ও বিনয়; মৈত্রেয়ী ও গার্গীর ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। আমরা যেন মৈত্রেয়ীর ন্যায় বলিতে পারি, "যাহা লইয়া আমি অমর না হই, তাহা লইয়া আমি কি করিব?" আমরা যেন গান্ধারীর ন্যায় বলিতে পারি, "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ!" আমরা যেন ধ্রুবের মাতার ন্যায় বলিতে পারি, "জগতে ত্রিতাপ-জ্বালা হয় নিবারণ, হেরিলে হৃদয়ে হরি পদ্মপলাশলোচন।" আমরা যেন সীতা-দময়ন্তীর ন্যায় বলিতে পারি, "জানিস্ না ওরে মূর্খ পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন, সতীত্বের তেজ অগ্নি বিষম কেমন।" আমরা যেন রমাবাইয়ের ন্যায় বলিতে পারি, "রাজা স্বামী রাজ্য-সুখে কি হবে আমার, যদি না ভাবিতে পাই হরি সারাৎসার?" এইরূপ পুরা-কালীন ভারতীয় উচ্চশ্রেণীর নরনারীগণের বহু প্রবচন, প্রবাদ-বাক্য, ও মহাবাক্য-সকল গ্রন্থাকারে, ও ভারতীয় নরনারীর হৃদয়-মধ্যে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিলেও সকল সময়ে,

সকল স্থানে, তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব, সারত্ব ও মহত্ত্বের সম্মান-রক্ষা, এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। পুরাতন-পত্রবিহীন শুষ্ক কাষ্ঠবৎ বৃক্ষেও যদি তাহার জীবনী শক্তি বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে বসন্ত-সমাগমে তাহাতে আবার নব নব কিশলয় ও নব নব ফলপুষ্প উদ্গত হইয়া চারিদিকে শোভা বিস্তার করিতে থাকে। তেমনি শুষ্ক কাষ্ঠবৎ পুরাতন মহত্ত্ব-বৃক্ষেও যদি জীবনী শক্তি বিদ্যমান থাকে, যদি জাতীয় প্রত্যেক নরনারীর ভক্তি-শ্রদ্ধা-সম্মানরূপ সারাংশ ও রস তাহার অভ্যন্তরে সঞ্চালিত হইতে থাকে, তাহা হইলে একদিন সুসময়ে তাহাতে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সভ্যতারূপ নব কিশলয় ও ফলপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া জগৎকে বিমোহিত করিবেই।

হে সকল উন্নতির মূলশক্তি! মঙ্গলময় বিধাতঃ! জাতীয় উন্নতির জন্য যে প্রত্যেক পরিবার, প্রত্যেক সমাজ ও প্রত্যেক ব্যক্তিকে উন্নত, সচ্চরিত্র, জ্ঞানী, বিদ্বান্, সভ্য ও পরোপকারী এবং তোমার জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে হইবে, ইহা যেন আমাদের প্রত্যেকের মনে নিয়ত জাগরূক থাকে। আর আমরা যেন পুরাতনকে ভুলিয়া না যাই এবং নূতনকেও অগ্রাহ্য না করি; যেন আমরা নূতন ও পুরাতনের সম্মিলিতভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া দেবতার ন্যায় হইতে পারি। যেন আমরা প্রত্যেক ব্যক্তি, পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞান, বিনয়, সেবা ও সচ্চরিত্রতায় এবং আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও সভ্যতায় নিজ নিজ জীবনকে সংগঠিত করিয়া জাতীয় উন্নতির সহায়তা করিতে পারি, পুরাতন লোকচক্ষুর অতীত স্থানই যে নূতন মহাসৌধের ভিত্তিভূমি, ও নূতনের চাকচিক্যই যে আশা, আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের জীবন এবং সর্ব্ববিষয়ে নূতন ও পুরাতন উভয়ের সারাংশের গৌরব রক্ষা করিয়া চলাই যে জাতীয় উন্নতির পরম সহায়তা, ইহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই! এই তোমার কাছে আমাদের প্রাণের প্রার্থনা।

শ্রীবসন্তকুমারী বসু।

ব্যথার দিনে।

আমি নিবিড় ব্যথার বিপুল বোঝাটি
যখন বহিতে থাকি,
তুমি পথটির পাশে কাশের বনেতে
লুকাইয়া যাও উঁকি।
ওগো কেন, ওগো কেন?
সম্মুখে আসিয়া হাসিয়া দাঁড়াতে,
কেন লাজ-বাস হেন?
না-হয় আমারে দিয়েছ ব্যথা,
না-হয় বোঝাটা হয়েছে ভারী,
তাই বলে কি গো ক'বনা কথা?
তব সনে মম কিসের আড়ি?

তুমি কত কত সুখ দিয়েছ মোরে,
দিয়েছ ভরিয়া আঁচলখানি,
ঘন বন্ধনে বেঁধে বাহুর ডোরে,
বক্ষ উপরে নিয়েছ টানি।
সে সুখের কথা ভুলি নি আমি,
ভুলি নাই এই ব্যথার ঘনে;

আজ লাজ-বাস আসিতে তুমি,
লুকায়ে রয়েছ কাশের বনে।
এস দেখে লই দুখের পথে,
দেখে লই দু'টি নয়ন ভরি ;
তারপরে লয়ে বোঝাটি মাথে,
দীর্ঘ পথে যাব আগুসরি।

সুখের দিনের বুকের স্বামী,
দুখের দিনে এস হে দেখি ;
কেন লুকাইয়া রয়েছ তুমি,
লাজ-নত মুখে দিতেছ উঁকি।

নরবেশ

নমিতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(২০)

সকল দিক্ হইতে বিশৃঙ্খল মনটা টানিয়া আনিয়া শান্ত সংযত হইয়া নমিতা গৃহস্থালীর কাজে ভিড়িয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ডাক্তার মিত্রের ক্রূর কটাক্ষ-স্মৃতিটা তাহাকে ক্রমাগতই একটা প্রতিহিংসার উত্তেজনায় ঝাঁঝাইয়া তুলিতে লাগিল। তাহার উপর দত্তজায়ার ব্যবহারগুলা মনে পড়িতে লাগিল। মনটা অস্বাভাবিক ঘৃণা-বেদনায় পরিতপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।—ছি, ছি, কি অদ্ভুত বর্ব্বরতাই ইহাঁদের অভ্যস্ত হইয়াছে? কাণ্ডজ্ঞান স্মরণ রাখিয়া কাজ করিতে ইহাঁদের এতটুকুও ইচ্ছা করে না? .....ঐ সব যথেচ্ছাচারিতা-সূচক ব্যবহারই, বুঝি, ডাক্তার মিত্রের মত ব্যক্তিদের মস্তিষ্ক সমূলে বিচলিত করিয়া দেয়। তাই তাঁহারা অসঙ্কোচে সমস্ত স্ত্রী-জাতি-সম্বন্ধে অপূর্ব্ব ধারণা পোষণ করিয়া বসেন! ভুলিয়া যান, একেবারে ভুলিয়া যান,—কুৎসিত-প্রবৃত্তি দাসত্বের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া যে আত্ম-সম্মান হারায় নাই, তাহার বুকের মধ্যে জাগ্রত গৌরবে যে নারীত্ব—যে তীব্র-চেতনাময় নারীত্ব বিরাজ করিতেছে,—সে নারীত্ব কেবল মাত্র বিলাস বৈভবে সমালঙ্কৃত হইয়া, হাবভাবে ঘৃণিত-চাতুর্য্য-কৌশলে নির্ব্বোধের দৃষ্টি-বিভ্রম উৎপাদন করিয়া কৃতার্থ হইতে চাহে না! সে নারীত্ব চাহে বিশ্ব-মানবের কন্যাত্ব, ভগিনীত্ব, মাতৃত্ব!

কথা-টা যখনই মনে পড়িতেছিল, তখনই রুক্ষ ঔদ্ধত্যের ঝাঁজ-ভরা মনটা ক্ষমা-করুণায় নম্র হইয়া আসিতেছিল। থাক্, ছেলে মানুষের মত ঝগড়া করিয়া কি হইবে? ডাক্তার মিত্র তাঁহার নিজের মনে বা চরিত্রের গঠন অনুসারে, জগতের সকলের মন ও চরিত্রের রীতি-আকৃতি সম্বন্ধে কল্পনা জল্পনা করুন,—নমিতা নমিতা-ই থাকিবে!—

গ্লানি-জর্জ্জর চিন্তা-অবসাদ এক পাশে ঠেলিয়া নমিতা শান্ত হইয়া দাঁড়াইল। বিমলের দ্বারা টাট্‌কা খবরের কাগজ আনাইয়া শুশ্রূষা-কারিণী ও শিক্ষয়িত্রীর জন্য কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন বাছিয়া বাছিয়া, যথারীতি আবেদন পত্র লিখিয়া পাঠাইতে লাগিল। সকলের

অগোচরে, গভীর রাত্রে লেখা শেষ করিয়া খুব ভোরে উঠিয়া সে ডাকে তাহা ফেলিয়া দিয়া আসিত। মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল, যদি চাকরী কোথাও জুটে, লক্ষ্মীর মাকে লইয়া সে চলিয়া যাইবে; এখানে আপাততঃ সকলে যেমন আছে, তেমনই থাকিবে। কারণ, বিমলের পরীক্ষা কাছাকাছি;—পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা হইবে।

যে প্রভুর শীলতাজ্ঞান নাই, তাঁহার ঔদ্ধত্য-গর্ব্বের নীচে নতশিরে সভয়ে দাসত্ব-লাঞ্ছনা-বহন অসহ্য ব্যাপার। মিথ কি প্রভু নহেন? তিনি কি প্রভুত্ব করেন না? প্রত্যেকের নিকট হইতে ন্যায্য কর্ত্তব্য আদায় করিতে, তিনি ত ডাক্তার মিত্রের চেয়েও বেশী কঠোর।—কিন্তু তাঁহার গুণগ্রাহী দৃষ্টিতে, ন্যায়সঙ্গত কর্ত্তব্য-পালনের জন্য প্রত্যেক কুলী-মেথরটি পর্য্যন্ত সমান স্নেহে আদরণীয় নহে কি? কিন্তু ডাক্তার মিত্র? তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত, সম্পূর্ণ! সিনিয়ার 'এ্যাসিষ্টেণ্ট' সার্জ্জন সত্যবাবু বুড়া হইয়া গিয়াছেন। ডাক্তার মিত্র যখন তাঁহার সহিতও ঔদ্ধত্য-সূচক ব্যবহার করিতে ছাড়েন না, তখন ক্ষুদ্র প্রাণী 'ড্রেসার কম্পাউণ্ডার'রা তাঁহার কাছে সদয় ব্যবহার লাভ করিবে, ইহা সম্পূর্ণই অসম্ভব! যাউক্, তাহাদের চিন্তা তাহারা বুঝিবে! এখন নমিতার মত সহায়-সম্পত্তিহীন ক্ষুদ্র মানুষকে সময় থাকিতে পথ দেখিতে হইবে;—অনিষ্ট সম্ভাবনা জানিয়াও প্রতিকার-চেষ্টার কষ্ট সহিবার ভয়ে নিরীহ ভাল মানুষ সাজিয়া উদাসীনভাবে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিয়া নিরুপায় সহিষ্ণুতার আদর্শ দেখাইবার লোভ নমিতার অন্তরে নাই। অসন্তোষ আসিয়া যখন তাহার অন্তঃকরণটা ক্ষিপ্ততায় মাতাইয়াছে, তখন উপায় একটা খুঁজিতে হইবেই! পিতার মর্য্যাদা-গৌরব ভুলিয়া আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিতে সে পারিবে না;—তাহার জন্য সকল রকম অসুবিধা সে সহিতে প্রস্তুত! দাসত্ব-লাঞ্ছনায় পদাঘাত করিয়া উপবাসে দেহ-নিপাত করিবার মত প্রাণের জোর তাহার খুব আছে, কিন্তু সুশীল-সমিতার ক্ষুধা-ক্লিষ্ট মুখের শুষ্ক দৃশ্য কল্পনায় আনিতেও যে ভয়ে প্রাণ শিহরিয়া উঠে! চাকুরী মজুদ না করিয়া চাকুরী ছাড়া হইবে না। সেই পর্য্যন্ত নীরব ধৈর্য্য অবলম্বনীয়!

পাঁচদিন কটিয়া গিয়াছে, ক্ষত ধৌত করিতে সমুদ্রপ্রসাদ প্রত্যহ নিয়মিতরূপে আসিয়া থাকে। সুরসুন্দর যে কারণেই হৌক, কার্য্যব্যস্ততার ওজুহাতে এ কয়দিন এদিক্ মাড়ায় নাই। অবশ্য, কাজের চাপটা তাহার এমন বেশী পড়িয়াছে সত্য; যে-হেতু পুরাতন ডাক্তার-সাহেব তাঁহার মেমের পীড়ার জন্য টেলিগ্রামে ছুটি মঞ্জুর করাইয়া, হঠাৎ কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন; তাঁহার স্থানে নবীন সিবিল সার্জ্জেন কাপ্তেন জ্যাক্‌সন গত পরশু আসিয়াছেন। কাজেই ঔষধ প্রভৃতির ব্যাপার লইয়া সুরসুন্দরকে অত্যন্ত খাটিতে হইতেছে। তবে ইহার মাঝে দুঃস্থ দুঃখীর জন্য অন্য কাজেরও বিরাম নাই। কিন্তু কে জানে কি ভাবিয়া, সে নমিতার হাতের সংবাদ লইতে আসে নাই। মিস্ স্মিথও 'ফিমেল ওয়ার্ড' লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন; তবু তিনি দুই দিন আসিয়াছিলেন। নমিতা তাঁহার কাছে এক

আশ্চর্য্য শুভ সংবাদ শুনিয়াছে যে, ডাক্তার মিত্র না কি আজকাল খুব 'ভালছেলে' হইয়া, শান্তভাবে মনোযোগ দিয়া কাজ করিতেছেন। বুড়া সত্যবাবু অপেক্ষা তিনি বেশী ক্ষমতাশালী, কাজ-কর্ম্মে চট্‌পটে, কাটাকুটিতে সুন্দর ক্ষিপ্রহস্ত; দৃষ্টিও তাঁর বেশ সূক্ষ্ম; সুতরাং 'কাজ দেখাইয়া' ছোক্‌রা ডাক্তার-সাহেবকে খুসি করিয়া, তিনি এখন হাঁসপাতাল শুদ্ধ সকলের উপর অত্যন্তই অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাইতেছেন! এমন কি 'ফিমেল ওয়ার্ডে' ডাক্তার সাহেবের সহিত চক্র দিতে গিয়া মিস্ স্মিথের কার্য্য-অবহেলার কাল্পনিক ত্রুটি আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেও ছাড়েন নাই।

আজ সকালে সমুদ্রপ্রসাদ আসে নাই। নমিতা বুঝিল কাজ পড়িয়াছে। সে নিজেই ঘায়ের উপর-উপরটা কোন রকমে ধুইয়া লইল। অন্যান্য কাজ সারিয়া, পুরাতন ডাক্তারি বহি-গুলি বাহির করিয়া, রৌদ্রে দিয়া, উদাস করুণ দৃষ্টিতে সেগুলির পাতা উল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে নানা কথা ভাবিতেছিল।—আহা, জীবনে একবার যদি বছর কয়েক অবসর পায়, তবে প্রাণের আশা মিটাইয়া এই অসমাপ্ত শিক্ষা—এই চিকিৎসা-বিদ্যাটা শিখিয়া লইয়া সে তৃপ্ত হয়। এগুলোর দিকে দৃষ্টি পড়িলে আজও মনের মধ্যে অধীর আগ্রহ দুর্দ্দাম ব্যাকুলতায় মাতিয়া উঠে।.....হায়, সংসারের যুগ অভাবগুলি মিটাইয়া দিবার জন্য, মাথার উপর যদি একজন উপার্জ্জনশীল আত্মীয় অভিভাবক কেহ থাকিতেন, তবে যত বড়ই দুঃখ-কষ্ট হউক, সব সাদরে মাথায় বহিয়া নমিতা আবার সেই পূর্ব্ব-পরিত্যক্ত ছাত্রী-জীবনের অঙ্কে গিয়া দাঁড়াইতে পারে! জীবনের সমস্ত শক্তি ঐ শিক্ষা, ঐ সেবা-সাধনার চরণে উৎসর্গ করিয়া দেয়!

উন্মনা হইয়া নমিতা নানা কথা ভাবিতে লাগিল। ধীরে ধীরে হাঁসপাতালের স্মৃতি মনে পড়িল।—হাঁ শিক্ষার ক্ষেত্র বটে! কি বিপুল আয়োজন! হাঁসপাতালের কাজে খাটিতে খাটিতে, নূতন নূতন শিক্ষার আনন্দে, মন কত আশায়, কত আগ্রহে, কত কৌতূহলে ভরিয়া উঠে! তাহার ঔৎসুক্য দেখিয়া স্মিথ্ কত যত্নের সহিত তাহাকে সাদরে শিক্ষা দিয়া থাকেন? নমিতা সে সব শিখিতে শিখিতে অবস্থার দুঃখ ভুলিয়া যায়, শরীরের ক্লান্তি ভুলিয়া যায়! দুঃসহ দাসত্ব,—তাহাও আনন্দময় অমরত্ব-সাধনার তপস্যা বলিয়া মনে হয়! দত্তজায়া গ্রন্থের ঈর্ষাশ্লেষে তীব্র পরিহাস করিয়া থাকেন!—করুন, কিন্তু সত্যই নমিতা মিস্ স্মিথের অনুগ্রহে, অনেক অনেক জটিল তথ্য শিখিয়া থাকে।

সুশীল ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "দিদি, তেওয়ারী কম্পাউণ্ডার আর সমুদ্র সিং দু'জনে বাইরে এসে বসে আছে; তুমি শীঘ্রি এস—।"

বিস্মিত হইয়া নমিতা বলিল, "এত বেলায়? কোন দরকার আছে?"

তাড়াতাড়ি জ্যাকেটটা টানিয়া গায়ে দিয়া, গলার বোতাম আঁটিয়া, কাপড় চোপড় ঠিক্ ঠাক্ করিয়া নমিতা বাহিরে আসিল। বাহিরের ঘরে চৌকাঠের সামনে দাঁড়াইয়া সুরসুন্দর নিশ্চিন্ত মনোযোগে খবরের কাগজ পড়িতে-ছিল।—এক ধারে বেঞ্চির উপর বসিয়া সমুদ্র-প্রসাদ হড়্‌বড়্ করিয়া বাক্‌চ্ছ পাশে বসিয়া বিমল সকৌতুক হাসিতে হাসিতে তাহার গল্প শুনিতেছিল। নমিতা ঘরে

ঢুকিতেই কাগজ হইতে চোখ তুলিয়া সুরসুন্দর বলিল, "আপনার হাতটা ধোয়া হয়ে গেছে? কিন্তু আমাদের যে একবার দেখ্‌বার দরকার আছে—!"

নমিতা কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই সমুদ্রপ্রসাদ ব্যস্তভাবে অগ্রসর হইয়া বলিল, "সে হবে পরে। মিস্ মিত্র, আপাততঃ শুনুন একটা সুসংবাদ।—আমাদের হাসপাতালের সবাইকার—অর্থাৎ বড় ডাক্তার সত্যবাবু থেকে, যতগুলো অবাধ্য দুষ্টু ড্রেসার, কম্পাউণ্ডার, নার্স আছে,—সবাইকার শ্রাদ্ধাধিকারী স্থির হয়ে গেছে। আর মরণোত্তর-কালের ভয়-ভাবনা নাই।"

কুনুইয়ের ঈষৎ ধাক্কায় সমুদ্রকে পিছনে ঠেলিয়া হটাইয়া সুরসুন্দর বলিল, "আপনার হাতটায় মোটেই পুঁজ হয় নি; ভালই হয়েছে। আর 'ব্যাণ্ডেজ' প্যাণ্টে নিয়ে যাই। একটু মলম রেখে দিন। সব তৈরী করে এনেছি,—।" পকেট হইতে জিনিসগুলি বাহির করিতে করিতে সুরসুন্দর বলিল, "সমুদ্র, ব্যাণ্ডেজটা খোল!"

খুব রাগের ভাব দেখাইয়া সমুদ্র বলিল, "আসুন মিস মিত্র, ওরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক। মানুষকে কষ্ট দিয়ে জব্দ না করলে ত ওর আহ্লাদ হয় না!"

সমুদ্রপ্রসাদ আদেশ পালন করিল ও আপন মনে গজ্ গজ্ করিতে করিতে বলিল, "আমাদের ছোট ডাক্তারবাবু 'কার মাথা খাই', 'কার মাথা খাই' করে চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরছেন। এই সব নিরীহ প্রাণীর বেওয়ারিশ মুণ্ডুগুলা হাত-ছাড়া হয়ে গেলে, তাঁর ক্ষুধা-শান্তির পক্ষে বিষম ব্যাঘাত হবে। এ ত বড় মুস্কিল!....."

সে আরও বকিয়া যাইতেছিল, পিছন হইতে সুরসুন্দর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার হাত টিপিয়া ধরিয়া বলিল, "সর, অত শব্দ শব্দ করে ঘা-ধোয়ান হয় না। দয়া করে সরে বস। আমিই কাজটা সেরে নি—।"

পরম আন্তরিকতার সহিত সমুদ্রপ্রসাদ বলিল, "কৃতজ্ঞ হলুম। আসুন বিমলবাবু, আমরা কথাটা শেষ করে ফেলি—।"

বিমলকে টানিয়া লইয়া বেঞ্চির উপর বসিয়া সমুদ্রপ্রসাদ গল্প করিতে লাগিল। আজ প্রাতঃকাল হইতে হাসপাতালে যে যাহা বলিয়াছিল ও যে যাহা করিয়াছিল, তাহার আদ্যোপান্ত বিবরণ বর্ণনা করিতে করিতে হঠাৎ নমিতার দিকে চাহিয়া সে বলিল, "আচ্ছা, আমাদের 'মাদারের' অনুপস্থিতিতে ছোট ডাক্তারবাবু কোন দিন 'ফিমেল ওয়ার্ডে' 'আউট ডোরে' রোগী বিদেয় করতে গেছ্‌লেন?—তাঁর কাজ দেখে, আপনি কি কোন কথা মিস্ চাম্পিয়ানের কাছে বলেছিলেন?"

শঙ্কর চাকর প্লেটে গরম জল ঢালিয়া দেতেছিল, সুরসুন্দর তাহার সহিত ঠাণ্ডা জল মিশাইয়া হাত-সহা হইয়াছে কি না, পরীক্ষা করিতেছিল। নমিতাও সেই দিকে চাহিয়া-ছিল। সমুদ্রপ্রসাদের কথায় চমকিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া সে বলিল, "কই,—চাম্পিয়ান্ কি বলেছেন?"

সমুদ্রপ্রসাদ বলিল, "তিনি কিছু বলেন নি, বরং উল্টে অস্বীকার করলেন; কিন্তু 'মেই-আকড়া' মিসেস্ দত্তকে জানেন ত? তিনি না-ছোড়বান্দা; বল্লেন, 'হ্যাঁ—নমিতা মিত্রি বলেছে। আমি নিজের কানে শুনেছি।

চার্ম্মিয়ান্ 'না' বল্লে মান্‌ব কেন?'—দু'জনে খুব ঝটাপটি; দস্তুর মত ঝগ্‌ড়া। আমরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। ভাগ্যে ডাক্তার-সাহেব চলে গেছ্‌লেন তখন, আর 'মাদার' তো আজ হাঁসপাতালে মোটেই যান্ নি; কোথায় 'কলে' বেরিয়েছেন! 'শূন্য ঘরে হন্যে রাজা'—বা ডাক্তারবাবুকে ত ভাল মানুষ পেয়ে কেউ গ্রাহ্যও করে না।—তবু মাঝে পড়ে তিনি প্রাণপণে 'থাম থাম' করে চেঁচালেন। মিস্ চার্ম্মিয়ান রাগে লাল হয়ে হাঁস্‌পাতাল ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। তার-পরই আমাদের ছোট ডাক্তারবাবু ঐ শ্রাদ্ধের বায়না সই কর্‌লেন।"

রুদ্ধশ্বাসে সমুদ্রপ্রসাদের কথাগুলি শুনিয়া নমিতা বলিল, "ডাক্তার মিত্রের সম্বন্ধে আমি কি কথা বলেছি?—কিসের জন্যে এত ঝগ্‌ড়া?—"

সমুদ্র বলিল, "ছোট ডাক্তারবাবু রোগীদের মন জুগিয়ে আপনার মত তোষামোদ করে চলেন না বলে—।"

বাধা দিয়া নমিতা বলিল, "দাতব্য চিকিৎসালয়ের সাহায্য যাঁরা নিতে আসেন, তাঁরা অর্থের কাঙালী, সামর্থ্যের কাঙালী, অনুগ্রহের কাঙালী।—এতটুকুমাত্র সদয় ব্যবহার পেলেই তাঁরা কৃতার্থ হয়ে যান্। তাঁদের তোষামোদ করা, মন যোগান,—এ সব কথা বলাই ভুল। আমি তা কেন বল্‌তে যাব?.....তারপর বলুন, আপনার কথাটা শুনি—।"

সাগ্রহে সমুদ্রপ্রসাদ বলিল, "আপনি বলেন নি? ঠিক্। মিসেস্ দত্তের কথায় আমরা কেউ বিশ্বাস করি নি। বড়বাবুও করেন নি।—বিশ্বাস করেছেন শুধু ছোটবাবু!—তারপর শুনুন, আমার কথা। মেয়ে রোগীদের অবাধ্যতার জন্য ডাক্তারবাবু ধমক্ ধামক্ করেছিলেন বলে, আপনি চার্ম্মিয়ানের কাছে বলেছেন, 'দাতব্য চিকিৎসালয়ের সাহায্যের ব্যবস্থা দেখ্‌লে তীব্র ঘৃণায় ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়।—"

আশ্বস্ত হইয়া, ঈষৎ হাসিয়া নমিতা বলিল, "এই কথা? এর জন্যে এত মারামারী? .....আমি গরীব; গরীবের দুঃখ আমাদের প্রাণে আঘাত করে। দাতব্য চিকিৎসালয় সাধারণের সম্পত্তি; সেখানকার ব্যবস্থা-ত্রুটির সম্বন্ধে সাধারণের দিক্ থেকে কোন কথা বল্‌বার অধিকার কি কারুর নেই? কিন্তু ভুল করেছেন। আমি ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কেন কথা কইব? ডাক্তারবাবু তাঁর রোগীদের সঙ্গে শিষ্টালাপ করুন, আর অশ্রাব্য কটূক্তি করুন, তাঁর বিরুদ্ধে কোন কথা কইবার ক্ষমতাও আমার নাই, সাহসও নাই। আমি কেন অনধিকার-চর্চ্চা কোর্ব্বো? তবে সমগ্র হাঁসপাতালটার সম্বন্ধে বল্‌তে পারি; তার মধ্যে আপনিও আছেন, আমিও আছি;—আপনার আমার ত্রুটি অন্যায় সম্বন্ধে—।"

সমুদ্রপ্রসাদ বলিল, "ঐ ত মুস্কিল! ছল-চাওয়া মন্‌সা-ঠাকরুণ, ঐখানেই ফোঁশ্ করে কামড় দিলেন। গায়ের জোরে হাত, পা, ছুঁড়ে গলাবাজি কর্‌তে পার্‌লেই দুনিয়ার বাজারে জিৎ পড়্‌তো। মিসেস্ দত্তের সঙ্গে কথায় কে পেরে উঠ্‌বে বলুন?.....তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস একমাত্র ছোটবাবু ছাড়া আর কাউকে লক্ষ্য করে এ কথা বলা হয় নি!—যেন সমগ্র হাঁসপাতালটার মধ্যে ঐ এক

মহাপুরুষ ছোটবাবুটি ছাড়া আর লক্ষণীয় বস্তু কিছুই নাই! কি চমৎকার 'থিওরি'!—"

এইবার হঠাৎ নিজের মনের মধ্যে একটা চমক্ খাইয়া নমিতা দমিয়া গেল! সমুদ্র-প্রসাদ-কথিত "লক্ষণীয়-বস্তু"কে লক্ষ্য করিয়া যদিও সে চার্ম্মিয়ানের কাছে ও-কথা বলে নাই, তাহা নিশ্চিত সত্য;—তবুও ইহাই সুনিশ্চিত সত্য যে, ঐ "লক্ষণীয়-বস্তু"টি, সন্তোষের দিক্ হইতে হউক্ বা অসন্তোষের দিক্ হইতে হউক—সম্প্রতি নমিতার পক্ষে তীব্র চিন্তনীয় বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।.....আপনাকে নিরাপদ্ করিবার জন্য যে মনের সত্যকে অস্বীকার করিবে না। 'খট্‌কা' তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে—একটু! কিন্তু উহাঁরা আক্রমণ করিতেছেন যে উল্টা দিক্ হইতে!—এটা ত স্বীকার করা চলে না!"

নমিতাকে নীরব অন্যমনস্ক দেখিয়া সমুদ্র-প্রসাদ খানিকটা চুপ করিয়া রহিল; তারপর শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিয়া উঠিল, "সাধ করে বলেছি, ভাই তেওয়ারী,—এই কথা মিস্ মিত্র বলেছেন, তাই এত তর্জ্জন গর্জ্জন! 'ইওর-আনার'রা এত ভয়ানক অপমানিত হয়েছেন! কিন্তু সত্যের খাতিরে ঐ কথাটি যদি আমাদের 'মাদার' স্মিথ্, কি চার্ম্মিয়ান্,—নিদেন পুলিশ-সাহেবের পিস্‌তুত বোনের শাশুড়ীর ভাই-ঝি বল্‌তেন, তা'হলে দেখ্‌তে ও কথার দাম অন্য-রকম হ'ত;—'ইওর-অনার্'দের মানের কাজার ফুরসুৎ থাকৃত না; নিদারুণ দুশ্চিন্তায় পড়্‌তে হ'ত!—আর অন্যপক্ষের ঐ বুক ফুলিয়ে চোখ রাঙিয়ে—!"

সুরসুন্দর এতক্ষণ ঘাড় হেঁট করিয়া এক মনে নমিতার হাতের ঘা ধুইতেছিল। ইহাদের কথাবার্ত্তায় তাহার যে কিছুমাত্র মনোযোগ আছে, বা এ সকল তর্ক-দ্বন্দ্বের কোন শব্দ যে তাহার কাণে পৌছাইতেছে, তাহা তাহার শান্ত মুখের উদাসীন ভাব দেখিয়া এতক্ষণ কেহই অনুভব করিতে পারে নাই। এইবার সমুদ্রপ্রসাদের শেষ কথা তাহার সুপ্ত অনু-ভূতিকে বিদ্যুদাহতের মত চমকে উদ্দীপ্ত করিয়া, তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন নাড়া দিয়া সচেতন করিয়া তুলিল। ঘাড় ফিরাইয়া তীব্র দৃষ্টিতে সমুদ্রের পানে চাহিয়া, রুক্ষস্বরে সুরসুন্দর বলিল, "কাণ্ডজ্ঞান সংযত রেখে কথা বল। বর্ব্বরতার সীমা একটা আছে—।"

অপ্রতিভভাবে সমুদ্রপ্রসাদ থামিয়া গেল। সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ! সুরসুন্দর ক্ষিপ্রহস্তে ঔষধ দিয়া, 'ব্যাণ্ডেজ' বাঁধিয়া হাত ধুইতে বাহিরে চলিয়া গেল। সমুদ্র সসঙ্কোচে বলিল, "মিস্ মিত্র, আপনি এর পর সবই শুন্‌তে পাবেন। আগে আমার মুখে কিছু শুন্‌তে হোল, এর জন্য দোষ ধর্‌বেন্ না।"

"না—না, ওতে দোষের কি আছে?"—এই বলিয়া নমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁতে চাপিয়া ঠোঁটের শুক্‌না ছাল ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে, অপ্রসন্ন ভ্রূকুঞ্চন-সহ কি কতকগুলা কথা ভাবিতে ভাবিতে সরিয়া আসিয়া সে সুর-সুন্দরের পরিত্যক্ত খবরের কাগজখানা বেঞ্চির উপর হইতে তুলিয়া লইয়া অর্থশূন্য দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। মনের মধ্যে একটা প্রবল দুশ্চিন্তার ঘূর্ণীবাত্যা বহিতে লাগিল। সত্যই কি সে অসংযত-জিহ্বার দোষে অনধিকারচর্চ্চার অপরাধে অপরাধী হইয়াছে? নিজের অজ্ঞানে ভ্রমে পড়িয়া সত্যই কি সে ন্যায়ের দোহাই দিয়া অন্যায়

চাতুরী করিতেছে? ছোট ডাক্তারবাবুর প্রতি তাহার মনের ভাবটা ঠিক্ অনুগত ভক্তের মত নহে, তাহা ঠিক্; কিন্তু তাই বলিয়া নিতান্ত উদাসীনও যে নহে, তাহাও ত ততোধিক সত্য। তবে কি সে সত্য-সত্যই একটা অপ্রকাশ্য বিদ্বেষের ঝোঁকে মাতিয়া যথেচ্ছাচারের পথে পা বাড়াইয়াছে? মানুষের অন্যায় আচরণে ক্ষুণ্ণ হইতে গিয়া কি সে মানুষকে শুদ্ধ ঈর্ষা-অবজ্ঞার পাত্র স্থির করিয়া বসিয়াছে?...না, না, না। তাহা ত সে করে নাই; করিবার সাধ্যও যে তাহার নাই! পিতার শিক্ষা সে ভুলিতে পারিবে না; পারিবে না!...অসহ্য হইলে, মানুষের অন্যায়কে ঘৃণা করিতে পারে;—কিন্তু মানুষকে ঘৃণা? না, অসম্ভব!

হাত ধুইয়া, ঘরে আসিয়া হাত মুছিতে মুছিতে, বিমলের কাছে দাঁড়াইয়া সুরসুন্দর কি দুই-চারিটি কথা বলিল। বিমল বিস্ময়ের সহিত বলিল, "বাড়ী চল্লেন? কত দিনের ছুটি নিলেন?"

সুরসুন্দর বলিল, "তিন হপ্তা।"

চিন্তামগ্না নমিতা চমকিয়া বলিল, "কে?"

বিমল বলিল, "তেওয়ারী ছুটী নিয়ে বাড়ী যাচ্ছেন। ওঁর ছোট ভাইটির বড় অসুখ—!"

সুশীল এতক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়াছিল। এইবার ব্যগ্র-চঞ্চল হইয়া সে ত্রস্তে বলিল, "ছোট ভাই? সেই যে টি আমার মত?—প্রেমসুন্দর?"

সুশীলের মাথাটি ধরিয়া স্নেহভরে একটু নাড়া দিয়া বিষণ্ণ হাস্যে ঘাড় নাড়িয়া সুরসুন্দর নীরবে জানাইল "হাঁ—।"

নমিতা একবার সুশীলের মুখপানে ও একবার সুরসুন্দরের মুখপানে চাহিল। মুহূর্ত্তে নিজের ভিতরের দুশ্চিন্তা-দ্বন্দ্ব-বিপ্লব বিস্মৃত হইয়া একটা নম্র-কোমল সহানুভূতির ব্যথায় তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিল। করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া নমিতা বলিল, "কি হয়েছে আপনার ভাইটির?—কি অসুখ?"

নতমুখে ললাটের শিরা টিপিয়া ধরিয়া সুরসুন্দর বলিল, "Hemptysis. রোগটি এখন বড়ই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু চিকিৎসা-শুশ্রূষায় হোল না; বায়ু-পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়েছে। পাহাড়ের বা সমুদ্রের হাওয়া চাই।" ক্ষণেক থামিয়া ক্ষুণ্ণভাবে পুনরায় সে বলিল, "দু' মাস থেকে ছুটিরদরখাস্ত করছি, এতদিনে মঞ্জুর হোল,—আজ! তাও স্মিথ্ না-থাকলে হোত না। কাল থেকে ছুটি। আমি আজ রাত্রের ট্রেণেই যাব। আপনাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না, হয় ত! এইখান থেকেই তবে—আসি!—নমস্কার।"

প্রতিনমস্কার করিয়া নমিতা বলিল, "লাহোরে চল্লেন?"

শান্ত করুণ দৃষ্টি তুলিয়া সুরসুন্দর বলিল, "লাহোরে ত কেউ থাকে না এখন—!" পরক্ষণে ব্যথিতভাবে একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, "এখন সব কল্‌কাতায় থাকেন, মেজ ভাইয়ের পড়া-শুনার জন্যে—।" কথাটা বলিতে বলিতে কি ভাবিয়া সামলাইয়া লইয়া,—"আসি তবে" বলিয়া ব্যস্ত-চঞ্চলভাবে সমুদ্রকে টানিয়া লইয়া সুরসুন্দর অগ্রসর হইল। দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া, সহসা মনে পড়ায় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমার কাগজটা?"

"এই যে নিন্—"বলিয়া ত্রস্তে বেঞ্চির উপর পূর্ব্বস্থানে নমিতা হাতের কাগজটা

ফেলিয়া দিল, এবং পরক্ষণে নিজেই সেটা তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইয়া সস্মিত মুখে বলিল, "না, এই নিন্—।"

কাগজটি হাতে লইয়া পুনশ্চ নমস্কার-ছন্দে তাহা কপালে ঠেকাইয়া, বিদায়-ম্লান-হাস্য-রঞ্জিতমুখে সুরসুন্দর বলিল, "তবে চল্লুম্ এখন। আপনারা একটু সাবধানে থাকবেন্। স্মিথ্ থাক্‌তে কোন ভাবনা নাই। তিনি আমাদের মায়ের মতই। তবু বুঝে চল্‌তে হবে। সাবধানে থাক্‌বেন্। বিমলবাবু, সমুদ্র রইল। যখন যা দরকার হবে, কোনো দ্বিধা বোধ করবেন না—।"

সসৌজন্যে ধন্যবাদ দিয়া সময়োচিত কথা-বার্ত্তা কহিতে কহিতে বিমল তাহাদের সঙ্গে গৃহের বাহিরে চলিয়া গেল। সুশীলও পিছু পিছু গেল।

নমিতার পা সরিল না। ভারাক্রান্ত চিত্তে সে বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িল। কিছুই না, সুরসুন্দর নিতান্তই পর! কিন্তু ঐ হাঁস-পাতালের সম্পর্ক-সংস্রবে, পরের কাজে খাটিতে খাটিতে, পরস্পরের সহায়-নির্ভরতা পরস্পরের মধ্যে কি সুশান্ত নীরব স্নেহবন্ধনের সৃষ্টি করিয়াছে! অবশ্য লঘুহাস্যে ব্যঙ্গ করিয়া ইহা উড়াইয়া দিলে, বিদ্রোহিতা করিবার জন্য কেহ কামান পাতিবে না, তাহা সুনিশ্চয়। তবু, এই যে বিদায়ের মুহূর্ত্তে সুস্পষ্ট অনুভূত সকরুণ স্নেহের টান,—ইহা কি নিতান্তই উপেক্ষণীয়?—এই সুদূর প্রবাসের অঙ্কে, ঐ যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিচয়ের খণ্ড খণ্ড চিহ্নগুলা, ওগুলা সবই কি নিরর্থক বলিয়া ছাঁটিয়া ফেলা চলে?.....কে জানে? মানুষের বিচিত্র অনুভূতি! বিভিন্ন মত!—বিবিধ বিধান! হয়ত উহা কিছুই নয়; তবু আজ এইখানে!—হাঁ, মনে হইতেছে বৈ কি! একই বৃহৎ পরিবারের অন্তর্গত আত্মীয়তা-প্রীতিবদ্ধ নমিতা, বিমল, সুশীল, সুরসুন্দর, স্মিথ্;—সবাই এক! এ আত্মীয়তার মাঝে ডাক্তার মিত্রকে কিংবা দত্তজায়াকে স্থান দিতে—কিছুনা না, কিছুমাত্র কার্পণ্য করা, দ্বিধা করা চলিবে না।

নমিতা ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া, চিবুকের ছোট ব্রণ খুঁটিতে খুঁটিতে চুপ করিয়া ভাবিতেছিল। সুশীল আসিয়া তাহার কোলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ব্যথিত করুণ কণ্ঠে বলিল, "জান দিদি, সেই ভাইকে উনি বড় ভালবাসেন! সেইজন্যেই ত আমায় উনি ভাল বাস্‌তেন। আমি না-কি দেখ্‌তে তারই মত এত বড়। —আর আমার গলার আওয়াজটা—উনি বলেন, সেও তারই মত। সে কি কি খেতে ভালবাসে জানো?—তালশাঁস। একদিন উনি আমায় ঐ কেটে খাওয়াচ্ছিলেন, আর বল্‌ছিলেন, কল-আঁটি সে খেতে খুব ভালবাসে। আর নাশ্‌পতি.....।"

বিস্ময়-ঔৎসুক্য দমন করিয়া নমিতা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তাই বুঝি, তেওয়ারী কম্পাউণ্ডার তোমার এত প্রিয়পাত্র?—থাক্, এতদিনে আমার সন্দেহ মিটল। ভাল, ও-রকম বন্ধুত্ব লাভের বটে!—আহা! বেচারীর ভাইটি ভাল হোক্।"

বিমল ঘরে ঢুকিয়া টেবিলের জিনিষপত্র নাড়াচাড়া করিতে করিতে অপ্রসন্নভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "ভাল হয় নি দিদি, ভাল হয় নি। কেন বাপু, পরের কথায় থাকতে যাও! ডাক্তার মিত্রি! চেন না ওকে?—বড়

ভয়ঙ্কর লোক! ওঁর সম্বন্ধে বাইরে যে-সব কথা শুনতে পাই—। বিমল ঢোক্ গিলিয়া থামিল।

নমিতার মুখ গম্ভীর হইল। বেঞ্চি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ধীরস্বরে সে বলিল, "ভুল করেছি বিমল! ঐ পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনের চাকরির কাজ চালাবার জন্যে যে রকম নির্জ্জীব যন্ত্র হওয়া উচিত, আমি তা হই নি ভাই! মান্‌ছি, ভুল করেছি। কিন্তু অন্যায় দেখে, আমার চেয়ে একদিনের বড় হতিস্, এখনি তোকে কাণ ম'লে দিতে অনুরোধ ক'রতুম! আর এমন—ভুল—!" সবেগে মাথা নাড়িয়া নমিতা বলিল, "কখনো নয়, কখনো নয়—!"

নিজের শয়নকক্ষে গিয়া নমিতা নিঃশব্দে দ্বার ভেজাইয়া দিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

ব্যর্থ-চেষ্টা।

সামনে দেখিয়ে ছুটিলাম আমি,
যতদূর মোর সাধ্য,
ধরিব বলিয়ে তোমারে আজিকে;
তুমি ত হ'লে না বাধ্য।
কাছে না যাইতে, পলক ফেলিতে,
লুকালে তুমি কোথায়!—
খুঁজিলাম কত, এ-দিকে সে-দিকে,
তবু না পাইনু হায়!
ফিরিতেছি যবে হতাশ হইয়ে,
আবার দেখিনু পাশে।
বিনতি করিয়া সাধিলাম কত,
চরণ-পরশ-আশে!
কহিলে না কিছু; হাসিতে হাসিতে
চলিয়া গেলে আবার!—
ফিরিলাম শেষে, ভাঙা বুকে মোর
ল'য়ে শুধু হাহাকার!
আপনা হইতে নাহি দিলে ধরা
কেহ না ধরিতে পারে!
অধীর আমরা শুধু ছুটাছুটি
করি বৃথা বারে বারে।

শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

অদৃষ্ট-লিপি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গৌরীপুর গ্রাম। দ্বিপ্রহর বেলায় দ্বিতলস্থ গৃহের বারাণ্ডায় বসিয়া, গোপীনাথের স্ত্রী মোহিনী বালিসের ওয়াড় সেলাই করিতেছিল। দরিদ্রা প্রতিবেশিনী কান্তর মা তাহার নিকটে (মশলা- ও চুয়া-যুক্ত) পানে পাইবার দোক্তা লইতে আসিয়াছিল। উঠানে পা দিতেই লাউ-মাচার প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। সাত আটটী নধর-কান্তি অলাবু দোদুল্যমান দেখিয়া কান্তর মাতার চিত্তে তাহার একটীর লাভের আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ যুগপৎ প্রবেশ করিল। সে সিঁড়ি বাহিয়া মোহিনীর কাছে উপস্থিত হইল।

একা বসিয়া, বুঝি, মোহনীর বিরক্তি বোধ হইতেছিল। ক্ষান্তর মা'কে দেখিয়া প্রসন্ন মুখে সে বলিল, "বোসো।" ক্ষান্তর মা' আশ্বস্তা হইয়া বসিল।

মোহিনীর চুল এলো ছিল। ক্ষান্তর মা' এ-কথা সে-কথার পরে বলিতে লাগিল, "আমি তা সব্বাইকে ব'লে থাকি—বৌদির চুলের যেমন ছিরি, এমন আর কারও নয়।" মোহিনী নিজ-কেশকলাপের সুখ্যাতি শুনিয়া একটু যে প্রীতিলাভ করিল না, এমন নয়। সে বিশেষ করিয়া ক্ষান্তর মঙ্গল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল।

আবার খানিকক্ষণ কথা-বার্ত্তা হইলে ক্ষান্তর মা জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাবাবু কোথায় গিয়েছেন, বৌদি?" মোহিনী কিছু অপ্রসন্ন-ভাবে বলিল, "তিনি তো আজ এক মাসের উপরে তাঁর বোনের বাড়ীতে ব'সে আছেন। ভগ্নীপতি বেড়াতে বেরিয়েছেন; তিনি তাই বোনের অভিভাবক হয়ে রয়েছেন।"

মোহিনীর কথার ধরণে চতুরা প্রতি-বেশিনী তাহার মনের কথা বুঝিল। বিস্মিতার মত বলিল, "তাই তো! নিজের বাড়ী-ঘর ছেড়ে বোনের বাড়ীতে রয়েছেন! তোমাদের কে দেখে তার ঠিকানা নাই!"

এই সহানুভূতি পাইয়া মোহিনী দ্রবীভূত চিত্তে বলিতে লাগিল,—"উনি তা' কোনদিনই বোঝেন না। বোনের জন্য বোনাইএর জন্য প্রাণ দিতে পারেন। আমার পটুলির সেবারে অসুখ হয়েছিল, তা'কে ভাত না দিতেই ঠাকুর-জামাইএর অসুখের চিঠি পেয়ে অমনি কলকেতায় গেলেন! দিন-রাত বোন্ বোন্ করে পাগল হ'ন্। আমি কোন্ কথা বলতে গেলে বলেন, 'ভুবনকে আমি গায়ের রক্ত দিয়ে নিজে মানুষ করিছি। ও ভূমিষ্ঠা হ'বার পরেই মায়ের অসুখ হ'ল। ঘরে আর লোক ছিল না। আমিই সেই একরত্তি মেয়েকে পালন করেছি। ভুবনের একটু অসুবিধে আমি সইতে পারি না।" তা বলতে কি, আমার পটুলি, শুঁটুলির চাইতে, আমার গুলুর চাইতে বোনেদের উপরে ওঁর মমতা!" ক্ষান্তর মা' এত বড় অসম্ভব কথা এই যেন জীবনে প্রথম শুনিল, এমনি মুখখানি করিয়া কহিল, "এমন কথা তো কখনই শুনি' নি বৌদি! তা বোন্ তো আমাদের মত গরীব কাঙাল নয়? তার আর অভাব কিসের?" মোহিনী উত্তেজিতা হইয়া বলিল, "বোন্ তো রাজরাণী! স্বামী কত টাকা রোজ্‌গার কোচ্চে! বাড়ীতে বামুন, ঝি, চাকর রয়েছে! স্বামী-স্ত্রীতে গাড়ী ক'রে কত জায়গায় বেড়িয়ে বেড়াচ্চে! কত লোককে কত দিচ্চে থুচ্চে! সে তো রাজরাণী! উনি কি! ভাগ্যে জমিদার-বাড়ীর কাজটুকু ছিল, তাই দিন চলে যাচ্চে। আর এই পৈতৃক দালানটা আছে, তাই বাছাদের নিয়ে কোন মতে মাথা রেখে আছি!"

ক্ষান্তর মা দয়ার্দ্র কণ্ঠে বলিল, "তা বৌ-দি যা'ই বল, দাদাবাবু বড্ড ভালমানুষ। আচ্ছা, ভুবন কত লোককে কত দেয় থোয় বোল্‌চো, তা তোমাদের কিছু দেয় টেয় কি?" মোহিনী গর্জ্জিয়া বলিল, "আমাদের আবার দেয় কি? —এই যে তা'র ভাইপো, ভাইঝি,—সে ইচ্ছে কোল্লে ওদের কি না দিতে পারে? সে-সব কিছু নয়। তবে ভাইকে খুব ভাল ভাল জিনিস খাওয়ায় আর খুব 'দাদা দাদা' করে। আর কিছুই নয়।"

ভুবনেশ্বরী গোপীনাথের পুত্রটীকে এবং কন্যা-দুইটীকে তিনটী গিনি দিয়া মুখ দেখিয়াছিল; প্রতিবৎসর পূজার সময়ে তাহাদিগকে সুন্দর পরিচ্ছদ দিয়াও থাকে। মোহিনী সে-কথার উল্লেখ করা অনাবশ্যক মনে করিল।

ক্ষান্তর মা খানিকক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিল; তারপরে বলিল, "এমন কথা তো কখন শুনি নি, বৌদি!—ভাইপো, ভাইঝি,—ওরা তো গায়ের রক্ত!—বাপের বংশ! পেটের সন্তানকে খাইয়ে পরিয়ে যে তৃপ্তি হয়, ওদের খাইয়ে পরিয়ে সেই তৃপ্তি হয়! আমার দাদা-শ্বশুর-বাড়ীতে ঘর-জামাই হয়ে রয়েছে। সেবারে আমার বড় ভাইপো এল, তাকে একখানা কাপড় দিলুম; তার ছাতা দিলুম। ছোট ভাই-বোনেদের জন্য খাবার নিয়ে যাবে ব'লে ছ' আনার পয়সা দিলুম; আরও কত দিতে ইচ্ছে হয়!" ইত্যাদি।

মোহিনী এই সহদয়ার সহানুভূতিতে অধিকতর প্রীতা হইল। তাহার প্রার্থনা অনুসারে সে তাহাকে একখানি পুরাতন সঞ্জীবনীর খানিকটা ছিঁড়িয়া, তাহাতে সেই মশলাযুক্ত চুয়ামাখা দোক্তা কতকগুলি ঢালিয়া দিল। ক্ষান্তর মা তাহা আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে লাউএর কথা বলিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে মধ্যাহ্নকালে মেঘোদয়ের মত, অপ্রত্যাশিত গোপীনাথ সহসা গৃহে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া ক্ষান্তর মা সন্ত্রস্ত ভাবে নীচে নামিতে লাগিল। মোহিনী দেখিল, গোপীনাথের মুখ বিবর্ণ ও বিষণ্ণ; তিনি বাক্যমাত্র না বলিয়া শয়ন-গৃহে গিয়া খাটের উপরে শুইয়া পড়িলেন।

পীড়া-সম্ভাবনা ভাবিয়া মোহিনী সেই ঘরে খাটের বাজু ধরিয়া দাঁড়াইল; ধীরে ধীরে বলিল, "অসুখ হয়েছে না কি? ঠাকুর-জামাই কবে এসেছেন?"

অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠে গোপীনাথ উত্তর করিলেন, "সর্ব্বনাশ হয়েছে বৌ! বজ্র্‌রা ডুবে গিয়েছে! রমাকান্ত ডুবে গিয়েছে। ভুবন আজ কাঙালিনী হয়েছে!" এই বলিয়া গোপীনাথ কাঁদিয়া উঠিলেন।

মোহিনী চমকিয়া উঠিল। হাজার হউক্ স্ত্রীলোক তো বটে! বলিল, "কি বল্লে! য্যাঁ? —কি সর্ব্বনাশ হ'ল!"

গোপীনাথ অশ্রু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "আর বোল্‌বো কি!—আজ্ পাঁচদিন ভুবন বিছানায় প'ড়ে আছে! তার যে আর কেউ নাই! তুমি একবার তার কাছে চল। আমার আদরিণী ভুবন আজ অনাথা হয়েছে! তুমি তার কাছে একবার চল।"

মোহিনী কি উত্তর দিত জানি না। এ-দিকে বিদ্যালয়-প্রত্যাগত গুলু, পটুলি ও শুটুলি "বাবা এসেছেন" বলিয়া, উঠানে আসিয়াই কোলাহল করিয়া উঠিল। তাহাদিগকে থামাইবার জন্য মোহিনী নীচে চলিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমা—

অক্ষয়-স্মৃতি।

আজিও পবিত্র তব নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস
ভরি আছে এ বিশ্বের আকাশ বাতাস।
আজো তব ভাবমুগ্ধ চিন্তাবিন্দুগুলি
পুণ্য করি বিশ্ববাসু ছুটিছে আকুলি!
আজো তব আঁখি-যুগে দেখা দৃশ্যরাজি
বিশ্বের গগনতলে রয়েছে বিরাজি!
ও-কর পরশ করা তরুলতারাজি
এখনো মৃত্তিকা-বক্ষে রহিয়াছে সাজি!
চৌদিকের চিত্রপট-পুঁথি-পত্রচয়
দেয় আজো বিশ্ব-মাঝে তব পরিচয়!

কত কত কণ্ঠে আজো এ বিশ্বের ঘরে
ধ্বনিত হতেছে নাম কি উদাত্ত স্বরে!
ধীরে ধীরে কালস্রোতে সব যাবে ভেসে;
রহিবে না চিহ্নমাত্র পুঁথি-বাস-বেশে!
ভুলে যাবে নিম্নদেশে শ্যামলা ধরণী,
ঊর্দ্ধে নীলাম্বর গ্রহ তারার বিপণি;
ভুলে যাবে ছয় ঋতু দিন বর্ষ মাস,
ফুল ফল আলো জল আকাশ বাতাস!
তখনো উজল হ'য়ে রবে মোর মনে
তোমার মধুর স্মৃতি অতিসঙ্গোপনে!

শ্রীক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

প্রার্থনা।

ওহে বিশ্বপতি, পুরুষ-প্রকৃতি,
কহি জোড় করি হাত,
যা দিয়াছ মোরে, সোহাগে আদরে,
পারি যেন তারে, নাথ,
যতন করিতে, হৃদয়ে রাখিতে,
আঁকিতে মানস-পটে,
ভূধরে সলিলে, এ নভোমণ্ডলে,
হেরিতে সকল ঘটে!
অবহেলা করে, ফেলে আমি দূরে,
দিই নাকো যেন তায়,
সাদরে তুষিয়ে, হৃদয়ে লইয়ে,
এ জীবন যেন যায়!
ক্ষুণ্ণ এ মনের দৈন্যভাব যেন
দূরে চলে যায়,—দূরে;
তাঁরি করুণায়, হিয়া ভরে যায়,
ভক্তিপ্রেমে রয় পূরে!

দয়াময় তুমি, জ্ঞান অন্তর্যামী,
মোদের মনের আশ;
যাতে শুভ হয়, হে করুণাময়,
ক'রো তাই অভিলাষ!
আপনার করে, দিয়াছ গো যাঁরে,
কৃপাভরে, পরমেশ!
যাচি পদে তব, হে প্রিয় বান্ধব!
সুখী যেন হয় শেষ!
দয়া-ধর্ম্ম-ভক্তি, সত্য-প্রেম-প্রীতি
লভি যেন ধ্যানে তাঁর;
আরাধ্য দেবতা, না ভুলে এ কথা,
সে চরণ করি সার!
নিজ গরিমায়, ভেসে নাহি যায়,
যেন স্ব স্ব প্রিয় ধন,
তেমতি করিয়ে, দোঁহে আবরিয়ে,
রাখ সখা!—আকিঞ্চন!

শ্রীবিমলাবালা বসু।

২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও
শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 654. February, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৫৪ সংখ্যা। | মাঘ, ১৩২৪। ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮। | ১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

নূতন খাতা।

আজ্ বেঁধেছি নতুন খাতা
লিখ্‌ব বলে' তোমার গাথা,
কইবো আমার মনের কথা
প্রাণের সরল ছন্দে;
প্রতি-আখর তোমার সুরে
বাজ্‌বে আমার হৃদয় জুড়ে'
নাচ্‌বে কেবল তোমায় ঘুরে'
উজল রসের গন্ধে!

কোন্ গাঁয়ের সে কোন্ বাগানে,
কোন্ বনের কোন্ পাখীর গানে,
কোন্ রঙের কোন্ ফুলের ঘ্রাণে,
কোন্ বিটপীর পত্রে,
তোমার সনে কখন সখা,
আমার হ'লো প্রথম দেখা,
সেই কথাটা আছে লেখা
পুরাণ খাতার ছত্রে।

তোমায় আমায় সে-দিন চিনা,
শুনিয়ে দিলে বিপুল বীণা,
গোপন সুরের ঠাঁই-ঠিকানা
সে-দিন দিলে জান্‌তে;
সেই আনন্দে ছিলাম বেঁচে,
এখন দেখি সে সব মিছে;
জানা-শোনা তফাৎ আছে,
এখন পেলাম শুন্‌তে!

কাজ্ নাই মোর বিফল জানা,
নিষেধ-বিধির জয়-নিশানা,
নানান্ ঘাটের নানান্ থানা
বাহাদুরীর দৃশ্যে;
তোমার জানা থাক্‌বে তোমার,
শিখ্‌বো আমি গাইতে এবার,
রক্ত ধারায় ভিজানো তার
বাজ্‌বে সকল বিশ্বে!

দরবেশ।

গানের স্বরলিপি।

মিশ্র ভৈরবী — দাদ্‌রা।

আকাশের আলোর সাথে মিল্‌বি যদি
সহজ হ';
কাননের ফুলের সাথে মিল্‌বি যদি
সহজ হ'!
তরু-মর্ম্মর পবন-দোলায়
নৃত্য-দোদুল তারার মালায়
যে গান দোলে, সেই দোলাতে
দুল্‌বি যদি সহজ হ'!
আনিস্‌ নে তোর ঘরের কথা,
বিজন মনের ব্যাকুল ব্যথা;
সহজ সরল শিশুর প্রাণে
বাহির হ' রে বাহির হ'!
দেখ্‌ রে চেয়ে আকাশ পানে,
বিশ্বভুবন ভরা গানে!
সেই গানের তালে তালে
হৃদয় মেলে সহজ হ'॥

কথা—শ্রীযুক্ত নিশ্চলচন্দ্র বড়াল, বি-এ। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

১´ ০ ১´ ০
II। সা মা -মমা। পা দদা -পা। I মা পা -া। জজ্ঞা -জ্ঞা মা I
আ কা শের আ লো০ র সা থে ০ মি০ ল্‌ বি

১´ ০ ১´ ০
I পা মা -া। জ্ঞা জজ্ঞা -ঋা I সা -া -া। -া -া -া I
য দি ০ স হ০ জ হ' ০ ০ ০ ০ ০

১´ ০ ১´ ০
I সা দা -পপা। পা ণদা -পা I পা দা মা। পণা -দা পা I
কা ন নের ফু লে০ র সা থে ০ মি০ ল্‌ বি

১´ ০ ১´ ০
I মা পা -া। জ্ঞা জজ্ঞা -ঋা I সা -া -া। -া -া -া। II
য দি ০ স হ০ জ হ' ০ ০ ০ ০ ০

১　　০　　১　　০
II দা দা -া। দা র্সা -র্সা I র্সা র্সর্সা র্সা। র্সা র্সর্সা -র্সা I
(১) ত ব ০ ম র্ম ০র প ব০ ন দো লা০ য়
(৯) দে খ্ রে চে য়ে ০০ আ কা০ শ পা নে০ ০

১　　০　　১　　০
I র্ঋা র্ঋা -া। র্সা র্সা -র্সর্সা I ণা র্ঋর্ঋা র্সা। ণা দদা -পা I
(২) নৃ ত্য ০ দো দু ০ল তা রা০ র মা লা০ য়
(১০) বি শ্ব ০ ভু ব ০ন ভ রা০ ০ গা নে০ ০

১　　০　　১　　০
I দা দা -দা। পা মা -া I পা ণা দা। মা -পা -া I
(৩) যে গা ন দো লে ০ সে ই দো লা তে ০
(১১) সে ই গা নে র ০ তা লে ০ তা লে ০

১　　০　　১　　০
I পণা -দা পা। মা পা -া I জ্ঞা জ্ঞজ্ঞা -ঋা। সা -া -া I
(৪) দু০ ল্ বি য দি ০ স হ০ জ হ' ০ ০
(১২) দু০ দ য় মে লে ০ স হ০ জ হ' ০ ০

১　　০　　১　　০
I { সা সা -সা। সা সা -ঋা I জ্ঞা জ্ঞজ্ঞা -মা। মা মা -া I
(৫) আ নি ম্ নে তো র ঘ রে০ র ক থা ০

১　　০　　১　　০
I জ্ঞা জ্ঞজ্ঞা -া। পা মা -া I জ্ঞা জ্ঞজ্ঞা ঋা। মজ্ঞা জ্ঞঋা -সা } I
(৬) বি জ০ ন ম নে র ব্যা কু০ ল ব্য০ থা০ ০

১　　০　　১　　০
I সা দদা পা। পা পা পা I মা পপা পা। পা পা -া I
(৭) স হ০ জ স র ল শি শু০ র প্রা ণে ০

১　　০　　১　　০
I মা মা -জ্ঞা। জ্ঞা জ্ঞা মা I জ্ঞা জ্ঞা -ঋা। সা -া -া II
(৮) বা হি র হ' রে ০ বা হি র হ' ০ ০

এই গানটি গত ভাদ্রমাসের "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র ১১২ পৃষ্ঠাতে প্রকাশিত। গানটিকে তালে আনিবার জন্য নামমাত্র একটু পরিবর্ত্তন করিয়াছি। দাদ্‌রা ছয়টি হ্রস্ব মাত্রার তাল। ঠেকা যথা :—

১　　০
I ধা ধি নাক্। না ধি নাক্ I
I সে যায় যাক্। না যায় থাক্ I

শ্রীমোহিনী সেনগুপ্তা।

প্রার্থনা।

মুক্ত কর সত্য হে নাথ! আজিকে শত বন্ধনে।
সার্থক করি লও হে মম বক্ষভরা ক্রন্দনে॥
অন্তরযামী, জ্ঞান হে তুমি,
তৃষ্ণা-সাগর হৃদয়-ভূমি;
রচ তটে তার সুধার আধার তোমার গৃহ-নন্দনে।
রুদ্ধ চিত্ত-কপাট খুলি'
নিত্য হে দেব! নয়ন তুলি'
নিরখি' ওমুখ, শিহরিবে বুক, পূজিবে ফুলচন্দনে।
মুক্ত কর সত্য হে নাথ! আজিকে সকল বন্ধনে॥

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

তপস্যা।

(১৩)

অবিনাশবাবুর বাটীতে বড় ধূম। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা লাবণ্যপ্রভার বিবাহ। ভবানীপুরের কোনও ধনাঢ্যব্যক্তির পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ হইবে। লীলার মাতা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—"কল্‌কাতার সহর, আর বড়লোকের ঘর নইলে মেয়ের বিয়ে দিতে দেবো না! তা' সে ছেলে যেমনই হোক্!" তিনি বলিয়াছিলেন যে, বিদ্বান্ ছেলে লইয়া কি তিনি ধুইয়া জল খাইবেন? 'পাড়া-গেঁয়ে' ছেলের সহিত লীলার বিবাহ দিয়াই লীলার এত দুঃখ, ইহাই তাঁহার সুদৃঢ় ধারণা। সেজন্য এবার অবিনাশবাবু গৃহিণীর ইচ্ছানুরূপ গৃহে কন্যার বিবাহ স্থির করিয়াছেন। পাত্রটীর "ব"-অক্ষর "গোমাংস" বলিলেই হয়; চরিত্রটীও তথৈবচ। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? গৃহিণীর বাঞ্ছিত ধনাঢ্যের পুত্র ত সে বটে! বাটীতে অনেক দাস-দাসী আছে, গাড়ী-ঘোড়া, মটর আছে! মেয়েকে নিতে লালপাগড়ী-মাথায় দ্বারবান্ আসিবে; ল্যাণ্ডো, মটরকার, কত কি আসিবে!—ইহাই ত গৃহিণী চান্। এই কল্পনায় তিনি অপূর্ব্ব সুখ ভোগ করেন। কুটুম্ব-কুটুম্বিনীতে বাটী পরিপূর্ণা! উৎসবের কিছুমাত্র ত্রুটী নাই।

সকলেই আনন্দে মগ্ন; কেবল লীলাই এ আনন্দে যোগদান করিতে পারে নাই। আক্ষেপে, অনুতাপে লীলা মরমে মরিয়া আছে। পতিবিরহ-বিধুরা লীলার সে রূপ-লাবণ্যরাশি আর নাই! তাহার ভ্রমর-কৃষ্ণ-কুঞ্চিত কেশরাশি আজ রুক্ষ; আয়ত চক্ষুর্দ্বয় কোটর-গত; তপ্তহেম-বর্ণ আজ পরিম্লান; পীবরতনু আজি ক্ষীণা! লীলাকে দেখিলে আজ সহজে চেনা যায় না! লীলার মাতার কন্যার এতটা মনঃপীড়া ভাল লাগে না। কুটীরবাসী দরিদ্র একটা যুবকের জন্য এত কেন? সময় সময় এজন্য লীলাকে যথেষ্ট শ্লেষবাক্যও শ্রবণ করিতে হইতেছে। তিনি পরিচিত, অপরিচিত, যাহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন, তাহাকেই বলিতেছেন, "দেখেছ, কি সব বেইমান্! আমি এত ক'রে মানুষ মানুষ কর্লুম, পেটে ধর্লুম!—আমি মরি 'মেয়ে, মেয়ে' করে, আর মেয়ে কি না, আমাকে গেরাহ্যিও করে না! আমার কথা যেন মেয়ের বিষ মনে হয়! কলিকাল কি না!"

কুটুম্বিনীগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, "ছোটবোনের বড় ঘরে বিয়ে হচ্ছে ব'লে, লীলা হিংসেয় ঘরের বা'র হয়েও একবার দেখ্‌ছে না।"

গৃহিণীও এ কথার সমর্থন করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ বোন্, হ্যাঁ! তোমরাই দেখ, আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে!"

হায়! দুঃখিনীর মর্ম্মবেদনা কেহ বুঝিল না! বুঝি এ জগতে তাহার বেদনা বুঝিবার কেহও ছিল না!

লীলার কাকা যামিনীবাবু অবিনাশবাবুর কনিষ্ঠ সহোদর ডেরাডুনে কাজ করিতেন ও সপরিবারে সেইখানেই বাস করিতেন। লীলাকে তিনি বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কিন্তু তিনি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া অবিনাশবাবুর সহিত তাঁহার বড় একটা ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল না। অবিনাশবাবুর স্ত্রী তাঁহার নামে অগ্নিশর্ম্মা হইতেন, কৃশ্চান, বিধর্ম্মী, 'সায়েব' বলিয়া তাঁহাকে অজস্র গালাগালি দিতেন। তাঁহার স্পৃষ্ট কোনও বস্ত্রাদি জলে ধৌত করিয়া ও গঙ্গাজল ছিটাইয়া তবে স্পর্শ করিতেন। এ সকল সত্ত্বেও যামিনীবাবু লীলাকে স্বীয় কন্যা অপেক্ষাও ভাল বাসিতেন এবং কোনও কার্য্যোপলক্ষে কখনও কলিকাতায় আসিলেই, ভ্রাতৃজায়ার ঘৃণা-অবজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া অগ্রজ অবিনাশচন্দ্রের বাটীতে সাক্ষাৎকারাদির জন্য আসিতেন। তিনি অতি-সদাশয় এবং মহৎ ও উদার চরিত্রের লোক ছিলেন।

যামিনীবাবু পূর্ব্বে যেমন আসিতেন, তেমনি এই বিবাহোপলক্ষে আসিয়া লীলাকে দেখিতে আসিলেন। আনন্দোৎসবের মধ্যে লীলাকে দেখিতে না পাইয়া তিনি বরাবর লীলার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। লীলা মাটীতে অঞ্চল বিছাইয়া শুইয়াছিল। লীলার আকৃতি দেখিয়া যামিনীবাবু স্তম্ভিত হইলেন; সস্নেহে লীলার হাতখানি ধরিয়া বলিলেন, "কেন মা, তুই এমন হয়ে গেছিস্?" সে-স্নেহ-সম্ভাষণে লীলার হৃদয় দ্রব হইয়া গেল। লীলা কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার পর সে বলিল, "কাকা, তোমার আদরের লীলার কপাল ভেঙেছে! এখন আশীর্ব্বাদ কর যেন শীগ্রি তার মৃত্যু হয়! তা হ'লেই সকল যন্ত্রণার শেষ হবে।"—এই বলিয়া লীলা তাহার কাকার কাছে আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল।

যামিনীবাবু সমস্ত শুনিলেন; শুনিয়া বলিলেন, "দাদার ঐ ত কেমন দোষ!—ভারী একগুঁয়ে। মেয়েই যদি পাঠাবেন্ না, তবে বিয়ে দেবার কি দরকার ছিল? জামাইয়ের সঙ্গে কি এম্নি ব্যবহার করে? ছ্যাঃ!"

লীলা বহুদিবস পরে একজন প্রকৃত আত্মীয়ের সঙ্গলাভ করিয়া তাঁহাকে মনের বেদনা জানাইয়া ও তাঁহার নিকট হইতে সমবেদনা প্রাপ্ত হইয়া কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিল। এই বৃহৎ-পুরীমধ্যে বহু আত্মীয়-মণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত হইয়াও সে একা। তাহার ব্যথার ব্যথী কেহ ছিল না! হৃদয়ভার লঘু করিয়া সে কনিষ্ঠা ভগিনীর জন্য একান্তে ভগবানের নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে লাবণ্যপ্রভার বিবাহ হইয়া গেল। খুব বাজনা বাজাইয়া, বাজী পোড়াইয়া-

আলো জ্বালাইয়া বর আসিল। আত্মীয়বর্গও তাহা দেখিয়া বড় আহ্লাদিত হইলেন।

বিবাহের আটদিন পরে এক গা গহনা গায়ে দিয়া লাবণ্য শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিল। আত্মীয়গণ কেহ গহনার প্রশংসা, কেহ বৈবাহিকের প্রশংসা, কেহ বা তাঁহার ধনের প্রশংসা করিয়া গৃহিণীর মনস্তুষ্টি সাধনের প্রয়াস পাইল।

(১৪)

চৈত্রের শেষভাগ। কলিকাতা-সহরে বেশ গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। লীলা তাহার কক্ষ-তলে অর্দ্ধশায়িত হইয়া অন্যমনস্কভাবে রাস্তার দিকে চাহিয়াছিল। সম্মুখের বাতায়ন উন্মুক্ত! বাতায়ন-মধ্য দিয়া লীলা কত লোক, কত দ্রব্য দেখিতেছিল, আর আকাশ-পাতাল, কত কি চিন্তা করিতেছিল! তাহার চিন্তার ইয়ত্তা ছিল না! পার্শ্বের কক্ষে লাবণ্য পিয়ানো বাজাইয়া গাহিতে ছিল—

কিছু নাহি চাহি সখা, আর!
চিরদিন রব গো তোমার!
তোমার চরণতলে
বিকায়েছি বিনিমূলে,
তুমি যে আমার প্রভু, কত সাধনার।
সাধিয়ে দিয়েছি প্রাণ,
নাহি চাহি প্রতিদান;
জীবনে মরণে শুধু রহিব তোমার!

সুমধুর-তানলয়-মিশ্রিত বালিকার মধুর কণ্ঠস্বর লীলার কর্ণে প্রবেশ করিয়া সহসা লীলার চিন্তাস্রোত রুদ্ধ করিল! লীলা একাগ্র-চিত্তে গানটী শুনিতে লাগিল। গাহিয়া গাহিয়া লাবণ্য নীরব হইল; কিন্তু লীলার হৃদয়-মধ্যে তখনও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল,—'সাধিয়ে দিয়েছি প্রাণ, নাহি চাহি প্রতিদান; জীবনে মরণে শুধু রহিব তোমার!'

এরূপ সময়ে যামিনীবাবু কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, "মা, লীলা!" লীলা ত্রস্তে পরিধেয় বসন সংযত করিয়া লইয়া বলিল, "কি কাকা?" যামিনীবাবু বলিলেন, "আজ আমি যাচ্ছি মা!" লীলা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "যাবেন্ কাকা! আর দিন-কতক থাক্‌লে হ'ত না?"

যামিনী। না, মা! এই ক'দিন, রইলুম্; আর থাক্‌তে পার্ব্বো না। সেখানে ছেলেমেয়ে-গুলো কি কচ্ছে কে জানে! তাদের দেখ্‌বার ত আর কেউ নেই! আমি আবার তোমায় দেখ্‌তে আস্‌বো। যা হবার হয়ে গেছে, আর ত কোন উপায় নেই মা! মিছে আর কেঁদে কেটে দেহটা কেন মাটি কচ্ছ? মনটা একটু প্রকৃতিস্থ রেখ মা!

লীলা। হ্যাঁ কাকা, মনকে প্রকৃতিস্থ রাখ্‌ব, মনে করেছি। আমি একটা উপায় ঠাউরেছি! কিন্তু আপ্‌নাকে একটু সাহায্য কত্তে হবে, কাকা! আপনি ভিন্ন আমার মুখ চাইতে আর কেউ নেই। আপ্‌নি ভিন্ন আমাকে আর কেউ ভালবাসে না কাকা!

যা। আমাকে কি কর্‌তে হবে বল মা! আমার সাধ্য হ'লে, আমি প্রাণ দিয়ে তা কোর্ব্বো।

লী। কাকা, আমাকে আমার শ্বশুর-বাড়ীতে রেখে আসুন্!

লীলার কথা শুনিয়া যামিনীবাবু বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে লীলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পরে বলিলেন, "সে কি মা! সেখানে তুমি কা'র কাছে যাবে?"

লীলা। আমার শ্বশুরের কাছে।

যামিনীবাবু নীরব রহিলেন; কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "দাদা তোমাকে তখন পাঠান্ নি, আর এখন পাঠাবেন কেন মা?"

লীলা। আমি তাঁকে লুকিয়ে যাব।

যা। সে কি হয় মা!

লীলা। কেন হবে না কাকা? বাপ-মা যদি সন্তানকে কর্ত্তব্য কার্য্যে বাধা দেন, সন্তান কি তা হ'লে কর্ত্তব্যকর্ম্মে পরাঙ্মুখ হবে? বাপ-মা সন্তানকে অধর্ম্ম কর্‌তে বল্‌লে, সন্তান কি সেই অধর্ম্মই কর্‌বে? আমার বুড়ো শ্বশুরের আর কেউ নেই। তাঁর সেবা না কর্‌লে আমার কি পাপ হবে না? তাঁর সেবা করা আমার কি প্রধান কর্ত্তব্য নয়? আপ্‌নিই বলুন্?

যা। তা ত বুঝ্‌লুম্! কর্ত্তব্য তো তোমার বটেই! কিন্তু ভগবান্ তোমাকে সে কর্ত্তব্য পালন কর্‌তে দিলেন কৈ?

লীলা। কাকা, আমাদের সকল কাজ ভগবান্ হাত ধরিয়ে করিয়ে দেন না! তিনি আমাদের জন্যে আমাদের সম্মুখে একটা অসীম অনন্ত বিরাট কার্য্যক্ষেত্র রেখে দিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে যাবার জন্যে বিস্তীর্ণ কর্ত্তব্য পথ রয়েছে। আমাদের সৎ-সাহস নিয়ে সে পথে চল্‌তে হয়। আমি যদি চিরদিন আমার বাপ-মাকে ভয় ক'রে চলি, আর আমার বুড়ো শ্বশুরকে একবিন্দু জল দিয়েও তাঁর উপকার না করি, তা হ'লে আমার মহান্ অধর্ম্ম হবে!

যামিনীবাবু নীরবে লীলার কথাগুলি শুনিতে লাগিলেন। লীলা আবার বলিতে লাগিল, "আপনার পায়ে পড়ি কাকা! আপনি আমাকে সেইখানে নিয়ে চলুন্! আর আমার এ সোণার পিঞ্জরে ভাল লাগ্‌ছে না! শ্বশুর গরীব হউন্, আর যাই হউন, মেয়েমানুষের শ্বশুরঘর করাই বিধি। এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘট্‌লে মেয়েমানুষ কখনও সুখী হ'তে পারে না। আমার শ্বশুরের সেই ভিটে আমার কাছে বৈকুণ্ঠ!" এই বলিতে বলিতে লীলা একবার থামিল ও তারপর ঢোক্ গিলিয়া আবার বলিতে লাগিল, "আমি তাঁর সঙ্গেই চলে যেতুম! কিন্তু কি বল্‌বো, আমার পোড়া অদৃষ্ট-দোষে, আমার কথা না শুনেই চলে গেলেন। আর কাকা, আমার মনে এখনও একটা ক্ষীণ আশা মাঝে মাঝে জেগে ওঠে! সবাই বলে তিনি নেই, কিন্তু আমার সে কথা বিশ্বাস হয় না। আমার মনে হয়, তিনি নিশ্চয় কোথাও আছেন। মনে হয়, বুঝি, একদিন তাঁকে দেখ্‌তে পাবই! তাই আমি এখনও হাতের নোয়া খুলি নি, এখনও সিঁদুর মুছি নি। মনে হয়, যদি শ্বশুরের ভিটেয় থাক্‌তে পারি, তা হ'লে কখন না কখন তাঁর দেখা পাব! কিন্তু এখানে থাক্‌লে ত তা পাব না! বাবা তাঁর বড় অপমান ক'রেছেন। তিনি আর এখানে আস্‌বেন না; এখানে কোন খবরও দেবেন্ না! তা' যদি দিতেন, তা হ'লে এতদিন নিশ্চয় তাঁর খবর পেতুম।"

লীলার জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিয়া যামিনীবাবু বড় আহ্লাদিত হইলেন; বলিলেন, "তুমি যা বলেছ মা, তা' তা বুদ্ধিমতীর মতই বলেছ! কিন্তু তোমার বাপ-মাকে কি বল্‌বে? তাঁদের যদি এ-কথা বলি, তা হ'লে তাঁরা কখনই সম্মত হ'বেন্ না! অধিকন্তু আমার উপর অত্যন্ত রাগ কর্‌বেন। একে

ত তাঁরা আমার নামে হাড়ে চটা! জানই ত মা!"

লীলা বলিল, "আমি বল্‌ব যে দিন-কতক আমি আপনার সঙ্গে বেড়াতে যাব। আমার শরীর খারাপ। এ-কথা বল্‌লে, মা যাই বলুন, বাবা নিশ্চয় মত কর্‌বেন। আমাকে কমলাপুরে রেখে আপ্‌নি ডেরাডুনে চলে যাবেন। আমি যাঁর কুলের বউ, তাঁর কাছে থাক্‌ব। আর আপ্‌নার ভয় কি? পরে যদি বাবা, মা জান্‌তে পেরে রাগ করেন, তাতে কারো কোন অনিষ্ট হবে না।"

যামিনীবাবু সম্মত হইলেন। সে-দিন আর তাঁহার যাওয়া হইল না। লীলা সন্ধ্যাকালে পিতার বিশ্রামকক্ষে গিয়া বলিল, "বাবা, কাকা কাল চলে যাচ্ছেন, আমি তাঁর সঙ্গে গিয়ে দিন-কতক বেড়িয়ে আস্‌ব। ক'ল্‌কাতা ছাড়া কখন অন্য দেশ দেখি নি! দেখতে বড় ইচ্ছা করে!" লীলা কর্ত্তব্য পালনের জন্য এই পথ অবলম্বন ভিন্ন অন্য উপায় দেখিতে পাইল না।

অবিনাশবাবু লীলাকে যথার্থই ভাল বাসিতেন। লীলা বহুদিন কোথাও বাহির হয় নাই। বহুদিন সে পিতার কাছে আব্দার করিয়া কোন কথা বলে নাই। তাই আজি লীলার মুখে এ-কথা শুনিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন এবং লীলার ডেরাডুনে যাইবার কথায় সহজেই সম্মত হইলেন। মাতা কিন্তু সম্মত হইলেন না। বিধর্ম্মী কৃশ্চানের বাড়ী মেয়ে গেলে পাছে তাঁহার জাতি-ভ্রংশ হয়, এই আশঙ্কাই তাঁহার অধিক! লীলার কথা শুনিয়া তিনি বিরক্ত হইয়া স্বামীকে বলিলেন, "সে মগের মুল্লুকে সোমত্ত মেয়ে একলা কোথায় যাবে? তুমি যে একেবারে ঢালা হুকুম দিয়ে দিলে?"

অবিনাশবাবু গৃহিণীর কথা গ্রাহ্য করিলেন না। গৃহিণী অপেক্ষা তিনি ততোধিক বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি কি ক্ষেপেছ না কি? সে তা'র নিজের কাকার সঙ্গে যাচ্ছে! একলা আবার কিসের?—যেতে চাচ্ছে যাক্; দিন-কতক বেড়িয়ে আসুক! তাতে তা'র শরীরটাও সার্‌বে, মনটাও ভাল হবে।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে লীলা তাহার খুল্লতাতের সহিত রওনা হইল। লোকে জানিল লীলা যামিনীবাবুর সহিত ডেরাডুন যাইতেছে; কিন্তু সে তাহার চির-আরাধ্য-ভূমি শ্বশুর-বাড়ীর অভিমুখে যাত্রা করিল।

(১৫)

লীলা তাহার বহু দিনের সাধনার স্থান—চির আরাধ্য ভূমি শ্বশুর-বাড়ীতে আসিল। তাহার কত দিনের বাসনা আজি সে পূর্ণ করিল। কিন্তু হায়! এ কি হইল! লীলা তাহার আরাধ্য দেবতার দর্শন পাইবে না, তাহা জানিয়াই আসিয়াছিল; কিন্তু যাঁহার সেবা করিবার জন্য সে এত করিয়া মাতা-পিতাকে লুকাইয়া কত আশা মনে ধরিয়া আসিল, তিনি কৈ? যে বৃদ্ধ শ্বশুরের চরণ-পূজার জন্য তাহার এত আগ্রহ, সেই পূজনীয় শ্বশুর তাহার এ পূজার অর্ঘ্য গ্রহণ করিলেন কৈ? তিনি ত সে বাটীতে নাই! কেবলমাত্র ভগ্ন পরিত্যক্ত গৃহগুলি পড়িয়া রহিয়াছে! মৃন্ময় প্রাচীরের স্থানে স্থানে জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। উঠানের মধ্যে মধ্যে বড় বড় বন্য বৃক্ষনিচয় জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর-শব্দে লীলার মনে হইতে লাগিল,

তাহারা যেন লীলাকে দেখিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল! যেন তাহারা বলিতে লাগিল, "নাই, নাই ;—তা'রা নাই!"

যামিনীবাবু লীলাকে লইয়া আসিয়া বড়ই বিপদে পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন, ছেলেমানুষের কথা শুনিয়া এ কি কাজ করিলেন! এ বাটীতে যে অনেক দিন লোক-সমাগম নাই, তাহা দেখিলেই বুঝা যাইতেছে। নিকটেও কাহাকে দেখিতে পাইতেছেন না যে, তিনি কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবেন!

লীলা বড় আশা করিয়া আসিয়াছিল যে, শ্বশুরের ভিটায় বাস করিয়া বৃদ্ধ শ্বশুরের সেবা-শুশ্রূষা করিয়া তাহার জীবনের একটা কর্ত্তব্য পালন করিবে। কিন্তু তাহার সে বাসনা নিষ্ফল হইল। সে সেই ভগ্ন কুটীর-তলে পতিত হইয়া কুটীরের ধূলিরাশি স্বীয় মস্তকে ও অঙ্গে লেপন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। পিতার সুখ-ভবনে সে এতদিন প্রাণ ভরিয়া ত কাঁদিতে পায় নাই! ভয়ে ভয়ে, লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদিয়া তাহার আশা মিটিত না। আজি সে স্বাধীনতার মুক্ত বায়ু লাভ করিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া বাঁচিল। —"ওগো, কোথায় তুমি? একবার এস, নারীর সর্ব্বস্ব-ধন! দুঃখিনীর আরাধ্য দেবতা! একবার দুঃখিনীকে দেখা দাও! হে আমার জীবনসর্ব্বস্ব! আমায় ক্ষমা কর; আমার এ তপস্যার বর দান কর। আমাকে আন্‌বার জন্যে কত চেষ্টা করেছিলে, তখন আস্‌তে পার নি। আজ আমি ভিখারিণীর বেশে আপনি তোমার দ্বারে এসেছি! আমাকে তোমার দর্শন-ভিক্ষা দাও।" লীলার এইরূপ আকুল ক্রন্দন দেখিয়া যামিনী বাবুও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। লীলাকে প্রবোধ দিবেন কি? তিনিই কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

কলিকাতা-সহরে কোনও বাটীতে কোনও ঘটনা হইলে, প্রতিবেশীরা তাহার বড় একটা সংবাদ জানিতে পারেন না। এমন কি, পার্শ্ববর্ত্তী বাটীর লোকেরও তাহা অজ্ঞাত থাকে। কিন্তু পল্লীগ্রামে সে-প্রকার হয় না। পল্লীগ্রামে যদি কোনও বাটীতে সামান্য কোনও ঘটনা ঘটে, তাহা প্রতিবেশীরা সকলেই জানিতে পারে, এবং উক্ত সংবাদ অতিরঞ্জিত হইয়া প্রচণ্ড বাতাসের ন্যায় গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পৌঁছে। লীলার ক্রন্দন শুনিয়া অনেক ব্যক্তি হরনাথবাবুর বাটীর অভিমুখে ছুটিয়া আসিল। অনেক দিন কেহ এ-দিকে আসে নাই। রাত্রিতে হরনাথ-বাবুর বাটীর সম্মুখস্থ পথ দিয়া চলিতেও লোকে ভয় পাইত। কারণ, তাহাদের বিশ্বাস, হরনাথ-বাবু "ভূত" হইয়া গৃহে অবস্থান করিতেছেন। রাত্রে মানুষ দেখিতে পাইলেই নিশ্চয় তিনি তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিবেন। কিন্তু দিনের বেলায় ভূতে আর কি করিতে পারিবে?—এই সাহসে ভর করিয়া প্রতিবাসিগণ একত্রিত হইয়া হরনাথবাবুর বাটীর দিকে গমন করিল। বিশেষতঃ তাহাদের কৌতূহল,—এই পরিত্যক্ত বিবর্জ্জিত ভগ্ন কুটীরে হঠাৎ কে উচ্চ ক্রন্দন করিতেছে! ভূত, না, মানুষ? এই কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্যই অধিকাংশ লোক তথায় উপস্থিত হইল।

যখন সকলে জানিল, যে-রমণীটী ক্রন্দন করিতেছে সে তাহাদের চিরপরিচিত সুহৃদ্ হরনাথ রায়ের পুত্রবধূ, তখন তাহাদের

কৌতূহল আরও শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। তখন আরও দলে দলে নরনারী সুধীরের বৌকে দেখিতে আসিল। কত লোকে কত কথা, কত প্রশ্ন করিতে লাগিল। একজন বর্ষীয়সী রমণী বলিল, "এখন আর কাঁদ্‌লে কি হবে বাছা! দাঁত থাক্‌তে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝ্‌লে না! এখন কাঁদ্‌লে কি আর সে ফিরে আস্‌বে? সে কি আর আছে?"

ওগো সে আছে গো, আছে! সে নেই তোমরা বলিও না। তাহা হইলে অভাগিনী লীলা আর বাঁচিবে না। সে আছে, সে আবার আসিবে,—সেই আশায় হতভাগিনী জীবনধারণ করিয়া আছে। নচেৎ তাহার ক্ষীণ দেহপিঞ্জর হইতে জীবন-বিহঙ্গ কবে উড়িয়া যাইত!

অপর একজন বলিল, "আহা বাছা, যে শ্বশুর তোমার ছেল! লোকে অনেক তপিস্যে কর্‌লে তবে অমন শ্বশুর পায়। ঠিক্ দশরথের মত শ্বশুর! বেটার বিয়ে দিয়ে বৌ নিয়ে ঘর-কন্না কর্‌বে,—বুড়োর কত সাধ! তা এমন বৌ হ'ল যে বুড়োকে একদিনের তরেও বৌ নিয়ে ঘর কর্‌তে হ'ল না।" আর একজন বলিল, "তখন যদি আস্‌তে বাছা, তা হ'লে আর এমন সোনার সংসারটা ছারখার হয়ে যেত না। ছেলেটা বিরাগী হয়ে গেল, না আপ্তখতি (আত্মহত্যা) হ'ল, তা কেউ জান্‌ল না! বেটার শোকে বুড়ো মধুমতীতে ডুবে ম'ল! তোমার দোষেই ত বাছা, সব ছন্ন ভন্ন হ'ল। এখন আর কেঁদে কি করবে? এখন যতই কাঁদ, যতই বুক চাপ্‌ড়াও, আর তারা ফির্‌বে না!"

এইরূপে লীলার ক্ষত অঙ্গে লবণ-প্রক্ষেপ করিয়া প্রতিবেশিগণ একে একে প্রস্থান করিল। যামিনীবাবু ব্যথিত হইয়া লীলাকে বলিলেন, "লীলা, চল মা, ফিরে যাই। বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হবে! মানুষের ত কোনো হাত নেই? সব ত শুন্‌লে? আর উপায় কি আছে মা?"

লীলা। কাকা, আপ্‌নি চলে যান্। আমি এখান থেকে আর ফিরে যাব না। এ আমার তপস্যা-ভূমি—তীর্থ স্থান। আমি এই খানে—এই মাটীর সঙ্গে আমার মাটীর দেহ মিশিয়ে ফেল্‌বো। আমি আর কোথাও যাব না।

মা। ছিঃ—মা, ও সব পাগলের মতন কথা কেন বল্‌ছ? এখানে কা'র কাছে আমি তোমায় ফেলে যাব?

লীলা। কাকা, আমার শ্বশুর মধুমতীতে ডুবে মরেছেন, আমিও তাই মর্‌ব। এ পৃথিবীতে আর আমার জুড়ুবার স্থান কোথায়?

যামিনী। লীলা! সুধীরের যে মৃত্যু হয়েছে, এর ত কোনও প্রমাণ নেই? হয় ত, তুমি যা বল্‌ছ তাই হতে পারে; একদিন সে ফিরে আস্‌তে পারে। আত্মহত্যা কর্‌লে ত আর তাকে দেখ্‌তে পাবে না, মা! ছিঃ তুমি এমন বুদ্ধিমতী হ'য়ে এ-রকম কথা মুখে এন না!

লীলার কিছুতেই ইচ্ছা হইতেছিল না যে, এখান হইতে ফিরিয়া যায়। এখানকার প্রত্যেক অণুকণাটীর সহিত সে মিশিয়া যাইতে চাহে। তাহার ইচ্ছা তাহার এ ক্ষণভঙ্গুর দেহ এই স্থানের ধূলিরাশির মধ্যে মিশিয়া যাউক্। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ।

মৃত্যুকে ডাকিলেই মৃত্যু আসে না। তাহার আসিবার সময় হইলে, কাহারও অনুরোধে সে ফিরিয়া যায় না।

যামিনীবাবু বলিলেন, "চল, দিন-কতক ডেরাডুনে বেড়িয়ে আস্‌বে। আমার কথা শোন। ইত্যাদি।" অনেক বলা-কহার পর, অনেক বুঝাইয়া তবে যামিনীবাবু লীলাকে লইয়া যাইতে সমর্থ হইলেন। পাড়ার একজন মাতব্বর লোকের হাতে কিছু টাকা দিয়া তিনি বলিয়া গেলেন, "যদি কখনও সুধীরের কোনও সংবাদ তিনি পান, তাহা হইলে ডেরাডুনে তাঁহাকে অবিলম্বে টেলীগ্রাম করিতে; এবং যদি কেহ তাঁহাকে সুধীরের সংবাদ দিতে পারে, তাহাকে তিনি প্রচুর পুরস্কার দিবেন।

(১৬)

নিদাঘের অপরাহ্ণ। প্রখর রবিকরতাপে ধরণী এখনও অত্যুত্তপ্তা। মধুমতীর প্রবল বারিরাশি এখন ধীর স্থির; ক্ষীণ-কলেবর! সূর্য্যদেব দিবসের কার্য্যান্তে বিশ্রাম-লাভের আশায় পশ্চিম আকাশে হেলিয়া পড়িয়াছেন। মধুমতী তাঁহারই প্রতিবিম্ব বক্ষে ধারণ করিয়া নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। পক্ষিকুল শাখায় বসিয়া কলস্বরে গান করিতেছে। ঝাউ- ও অশ্বত্থ-বৃক্ষসকল সন্‌সন্‌-শব্দে নদীতীর মুখরিত করিতেছে। জীর্ণ, শীর্ণ, রুগ্ন, বৃদ্ধ হরনাথবাবু নদীতীরে একাকী বসিয়াছিলেন। তাঁহার আর এখন যৌবনের সে উদ্দাম নাই, উৎসাহ নাই, কর্ত্তব্য-কর্ম্মে মনোনিবেশ নাই! পুত্র-বিরহাতুর বৃদ্ধ জীবনমৃতবৎ দিনযাপন করিতেছেন। সুধীর সেই যে স্ত্রীকে আনিতে বাটী হইতে গিয়াছিল, আর ফিরিয়া আসে নাই। আর তাহার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কত দিন, কত মাস, কত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, তবুও সে আসে নাই। আশায়, আশায় বৃদ্ধের কত দিন কাটিয়াছে!—প্রতি-পলে, প্রতিদণ্ডে, প্রত্যেক শব্দটীতে বৃদ্ধ ভাবিয়াছেন, "ঐ বুঝি সুধীর আসিতেছে!" কিন্তু হায়! কোথায় সুধীর! বৃদ্ধের সকল আশা আকাশকুসুমে পরিণত হইয়া যায়! বহির্জগতের সহিত বৃদ্ধের আর বড় একটা সম্বন্ধ নাই। অন্তর্জগৎ লইয়াই তিনি এখন অবস্থান করিতেছেন। হঠাৎ কেহ তাঁহাকে ডাকিলে উত্তরই পায় না; অথবা প্রশ্নের বিপরীত উত্তর পাইয়া থাকে।

হরনাথবাবু এখনও তাঁহার নদীতীরটির মমতা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এ-স্থানটী তাঁহার বড়ই প্রিয়! প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় যষ্টিভর করিয়া একাকী আসিয়া এইখানে তিনি বসিয়া থাকেন! আজিও সেইরূপ একাকী বসিয়া তিনি চিন্তা করিতে-ছিলেন। কেমন করিয়া ধীরে ধীরে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে, তাহাই দেখিতেছিলেন, এবং এইরূপে তাঁহার সৌভাগ্যসূর্য্যও অস্ত গিয়াছে, তাহা ভাবিতেছিলেন! আর ভাবিতেছিলেন, কবে শিশু সুধীর কোন্ কথাটী তাঁহাকে বলিয়াছিল, কোন্ কাজটী করিয়াছিল; কোন্ কোন্ তারিখে তাহার পাশের খবর বাহির হইয়াছিল! সেই যখন সে প্রথম কলিকাতায় যায়, তখন সে পিতাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেছে না বলিয়া পত্র লিখিয়াছিল। একবার সেই যখন তাহার বড় জ্বর হইয়াছিল, সেই যখন সে একাকী মেসের কক্ষমধ্যে শয্যায় শয়ন করিয়া ছিল

এবং "বাবা" "বাবা" বলিয়া ডাকিতেছিল ও মুদ্রিতনেত্র হইতে অবিরলধারে অশ্রু নির্গত হইয়া উপাধান সিক্ত করিতেছিল, তখন হরনাথবাবু সেখানে উপস্থিত হইলে, সুধীর পিতাকে পাইয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইল! পিতাকে দেখিয়া তাহার সকল কষ্ট, সকল যন্ত্রণা দূর হইয়া গেল! আর আজি সেই সুধীর কেমন করিয়া সকল মমতা বিস্মৃত হইল!

ওরে তুই যে বৃদ্ধের যষ্টি, অন্ধের চক্ষু, দরিদ্রের রত্ন, কত সাধনার ধন! তুই কেমন করিয়া আজি বৃদ্ধকে ফেলিয়া চলিয়া গেলি? হা রে অবোধ সন্তান! তুই পিতার বেদনা বুঝিলি না! পিতার এ বুকভরা ভালবাসার কি এই প্রতিদান দিলি? সকল মমতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া কেমন করিয়া তুই পলায়ন করিলি? কোথায় গেলি? আয় ফিরে আয়! ওরে তোকে বুকে নেবার জন্য যে স্নেহভরা একখানা প্রশস্ত বুক হাহা করিতেছে! তোকে আলিঙ্গন করিবার জন্য দুইখানি বাহু যে প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে! কোথায় গেলি? কেন গেলি? আয় ফিরে আয়!

রাজলক্ষ্মি! তুমি আজি কোথায়? তোমার এত আদরের সুধীর আজি গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহা তুমি দেখিলে না! অথবা তুমি গিয়াছ, বেশ করিয়াছ। তুমি যেখানে গিয়াছ, সেখানে শোক-তাপ নাই; জরা-মৃত্যু নাই; বিচ্ছেদ-বেদনা নাই! সে যে অমৃতময় লোক! শুধু সুখ, শুধু শান্তি! এখানে থাকিলে ত এমনই করিয়া পুত্রবিচ্ছেদে অন্তর দগ্ধ হইত! অথবা তুমি থাকিলে বুঝি বা তোমার সুধীর তোমার মায়া কাটাইয়া এমন করিয়া যাইতে পারিত না!

দূরে সেতু-বক্ষে বাষ্প-শকট গমনাগমন করিতেছিল, ছোট ছোট বাষ্পপোতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রদ্বারা বারিমন্থন করিয়া হু-হু শব্দে ছুটিতেছিল। তরণীগুলি কেহ পাল তুলিয়া, কেহ হাল বাহিয়া, তরঙ্গ তুলিয়া গন্তব্য স্থানে গমন করিতেছিল। বৃদ্ধ হরনাথ বালকের ন্যায় তদ্গতচিত্তে তাহাই দেখিতেছিলেন, আর ভাবিতেছিলেন "ঐ যে শত শত ব্যক্তিকে বহন করিয়া উহারা চলিয়াছে, উহার মধ্যে কি সেই একজন নাই? সেই একখানা মুখ! সে মুখ, সে দেহের ভার বহন করিতে কি উহারা সমর্থ হয় না? এত লোককে বহিয়া আনিতেছে, আর শুধু সেই একজনকে কি আনিতে পারে না? ঐ যে অত লোকের মুখ দেখা যাইতেছে, উহার মধ্যে কি সেই একখানা মুখ নাই?' বৃদ্ধ উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ—আর যে পারি না! ওরে তুই কোথায় গেলি? আয়, একবার আয়; একবার দেখা দিয়ে যা! আমি তোর কি করেছি রে যে, তুই আমাকে ছেড়ে চলে গেলি? ওরে একবার এসে আমায় 'বাবা' ব'লে ডাক্।"

বৃদ্ধ আবেগভরে কথাগুলি বলিয়া ফেলিলেন। ঠিক্ এমনই সময়, তাঁহার পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল, "বাবা!" হরনাথ-বাবুর হৃদয় দুরুদুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। এ কি এ! এ কা'র কণ্ঠস্বর? তিনি কি জাগ্রৎ, না নিদ্রিত? তিনি কি স্বপ্ন দেখিতেছেন? এ স্বর যে তাঁহার চিরপরিচিত! তাঁহার হৃদয়-কন্দরে যে প্রতিনিয়ত এই স্বর প্রতি-

ধ্বনিত হইতেছে। বুঝি, সেই প্রতিধ্বনিই বাস্তবভাবে প্রকাশিত হইয়া কর্ণপথে প্রবেশ করিল! আবার সেই কণ্ঠস্বর! আবার কে ডাকিল, "বাবা!" হরনাথবাবুর চিত্ত আরও অস্থির হইয়া উঠিল; কিন্তু ফিরিয়া চাহিতে তাঁহার সাহস হইল না। তিনি ভাবিলেন, ফিরিয়া চাহিলে যদি এ সুখস্বপ্ন ভগ্ন হইয়া যায়? আহা! এ মধুর ধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রাণ যে শীতল করিয়া দিল! বৃদ্ধ নীরব, নিশ্চল, প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ বসিয়া রহিলেন। তখন পশ্চাদ্দেশস্থিত ব্যক্তি বলিল, "বাবা, আমি এসেছি। আমায় ক্ষমা করুন্।"

আর কি হরনাথবাবু স্থির থাকিতে পারেন্! যাহার মুখ দেখিবার জন্য তিনি দিবানিশি উন্মত্তবৎ হইয়া আছেন, যাহার কথা শুনিবার জন্য তাহার সমস্ত জীবনটা আকুল, যাহার বিচ্ছেদে তাঁহার জীবনধারণ করা বিড়ম্বনা মনে হইতেছিল, সেই আসিয়া "বাবা" বলিয়া ডাকিতেছে, আবার ক্ষমা চাহিতেছে, পুত্রগতপ্রাণ বৃদ্ধ আর কি চুপ করিয়া থাকিতে পারেন?

তীরবৎ ফিরিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যাহা দেখিলেন, তাঁহার ক্ষীণদেহে তত আনন্দ নিশ্চল ভাবে সহ্য করা দুরূহ! আনন্দে, উচ্ছ্বাসে বৃদ্ধ কম্পিত কলেবরে ভূপতিত হইতেছিলেন। আগন্তুক অতিযত্নে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। তখন বৃদ্ধ দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন; ভাবিলেন, বুঝি, ছাড়িয়া দিলে আবার সে ফাঁকি দিয়া পলাইবে! তাই তাহাকে সজোরে বক্ষের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল, বুক চিরিয়া বুকের ভিতরে তাহাকে লুকাইয়া রাখেন! আগন্তুক অপর কেহই নহে; সে সেই আমাদের সুধীর।

(১৭)

দৈব-দুর্ব্বিপাকে সুধীর কারারুদ্ধ হইয়াছিল। দৈবদুর্ব্বিপাকে সে 'ল'-পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়াছিল। তজ্জন্য সে রোষে, ক্ষোভে, লজ্জায়, ঘৃণায় উন্মত্তবৎ হইয়াছিল। তাহার উপর শ্বশুরের নিকটে যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইয়া ক্রোধে সে দিক্-বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। কিরূপে সে স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিবে, কি প্রকারে অবিনাশবাবুর এ অপমানের প্রতিশোধ দিবে, তাহাই সে ভাবিতে লাগিল। নিজের পিতার উপরেও তাহার বড় রাগ হইল। কেন তিনি ধনাঢ্যের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন? শ্বশুর যদি পিতার সমকক্ষ ব্যক্তি হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সাধ্য হইত কি যে, সুধীরকে এরূপ ভাবে অপমান করেন? শেষে যতটা রাগ, যতটা অপরাধ গেল লীলার ঘাড়ে। লীলাকে বিবাহ করিয়াই ত তাহাকে এতটা অপমান সহ্য করিতে হইল। তাহার জন্যই ত এত কাণ্ড! তাই সে একটা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল: এ জীবনে আর লীলার মুখ দর্শন করিবে না। অবিনাশবাবুর বাটী হইতে বহির্গত হইয়া সুধীর আর গৃহে ফিরিল না। কোনও বন্ধুর সাহায্যে সে ইংলণ্ডে গমন করিল। তথায় কয়েকবৎসর থাকিয়া আই, এম্, এস্,-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'সিভিল সার্জ্জন' হইয়া সে ভারতে প্রত্যাগমন করিল।

কার্য্যস্থলে পিতাকে লইয়া যাইবে বলিয়া সুধীর বাটী আসিয়াছিল। লীলা যখন কমলা-

পুরে আসিয়াছিল, তাহারই কিছুদিন পূর্ব্বে সুধীর আসিয়া হরনাথবাবুকে লইয়া গিয়াছিল। সুধীর সন্ধ্যাকালে আসিয়া রাত্রের ট্রেনেই পিতাকে লইয়া যায়। গ্রামের কাহারও সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হয় নাই। পরদিবস হইতে কেহ আর হরনাথবাবুকে দেখিতে পাইল না। কাজেই তাহারা অনুমান করিল, পুত্রশোকে বৃদ্ধ মধুমতীতে আত্ম বিসর্জ্জন করিয়াছে। জনরব চিরদিন যেরূপ হয়, এস্থলেও সেইরূপ ঘটিল। কেহ কেহ বলিল, তাহারা হরনাথবাবুকে নদীতে নিমজ্জিত হইতে দেখিয়াছে, আবার কেহ বা বলিল, তাহারা বৃদ্ধকে জল হইতে তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু প্রবল তরঙ্গে তাহাকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল, তাহারা আর দেখিতে পাইল না।

সুধীর পিতাকে লইয়া কার্য্যস্থলে চলিয়া গেল, কিন্তু লীলাকে কোনও সংবাদ দিল না। নির্ব্বোধ যুবক সরলা সাধ্বীর মর্ম্মবেদনা বুঝিল না। দুরন্ত ক্রোধ ও অভিমান তাহাকে হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য করিয়াছিল। সুধীর গভর্ণমেণ্টের কার্য্য গ্রহণ করিয়া লাহোরে গমন করিলে, অত্যল্পকাল-মধ্যেই চিকিৎসা-বিদ্যায় তাহার অদ্ভুত পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল। অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকও তাহার সমকক্ষ ছিল না। এতদিনে সুধীরের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। সংসারের মধ্যে সে এখন একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। বৃদ্ধ পিতারও এখন চরম সুখ। তাঁহার সুদীর্ঘ সন্তান-বিচ্ছেদের যাতনা এখন সুখের পূর্ণমাত্রা প্রদান করিল। এ সুখের অধিকারে কেবলমাত্র একজন বঞ্চিত হইল। সে অভাগিনী লীলা! হরনাথবাবু একবার সুধীরকে বলিয়াছিলেন, "বাবা, যাই হউক্, ভগবানের কৃপায় মানুষ হয়েছ; এইবার বৌমাকে নিয়ে আসা যাক্।" তাহাতে সুধীর মুখ বিকৃত করিয়া বলিয়াছিল, "নিষ্প্রয়োজন!" তাহার পর ভয়ে আর কোন কথা বলিতে বৃদ্ধ সমর্থ হ'ন্ নাই। পাছে আবার তাঁহার পুত্রবিচ্ছেদ ঘটে!

বিনা অপরাধে সরলা রমণী পরিত্যক্তা হইল! হায়! এ-সংসারে মানুষ ভ্রমে পতিত হইয়া কত সময়ে যে কত অবৈধ কার্য্য করিয়া বসে, তাঁহার ইয়ত্তা নাই। এই বুদ্ধি লইয়া মানুষ আবার আপনাকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকে! ক্ষুদ্র মানবের ক্ষুদ্র বুদ্ধি, ক্ষুদ্র মন, ক্ষুদ্র কার্য্য! এই ক্ষুদ্র কার্য্যকে মানুষ একটা অনন্ত অসীম কার্য্য বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে। মানুষের বুদ্ধি-ভ্রংশ পদে পদে! রোগ-শোক-বিপৎ-সঙ্কুল পৃথিবীতে মানুষ ভগবানের ক্রীড়ার পুত্তলিকা। তাঁহারই ইচ্ছায় জীব চালিত হয়। কিন্তু হায়, মানুষ সে কথা স্বীকার করিতে চাহে না। মানুষের "অহং"-বুদ্ধি যে অতি-প্রবল! (ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

সুসার ও অসার।

ফেনপুঞ্জ ভাসি'রয় সাগরের জলে।
রতন লুকায়ে থাকে সুগভীর তলে॥
অসার নিয়ত নিজে প্রকাশিতে চায়।
সুসার গোপনে রহে দীপ্ত মহিমায়॥

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

ছাগশিশুর উক্তি।

অমার আঁধারে আজ এলি মা গো ধরণীতে,
ভবের তমসা নাশি জ্ঞানের আলোক দিতে।
তাই আজ বিশ্ব জুড়ে এত সুখ, এত প্রীতি ;
তাই বাজে ঘরে ঘরে তোর আগমনী-গীতি !
তাই আজ বেশভূষা, তাই এত আড়ম্বর !
আমি কি মা, বিনা দোষে যাব শুধু যমঘর !
সবারি আননে আজ শোভিছে হাসির রেখা ;
আমি শুধু হেরিতেছি মরণের বিভীষিকা !
আজি এ সুখের দিনে মোর প্রাণ-দণ্ড হবে ?
তোরি রাঙা পাদু'খানি আমার শোণিতে ধোবে !
লোকে বলে বধি মোরে তোর ভোগ প্রয়োজন;
সবে বলে ছাগরক্তে মা মোদের তুষ্ট হ'ন !

যদি মা গো সত্য হোস্, বল্ তবে সত্য করে,
আপন সন্তান-রক্ত মা কি কভু খেতে পারে ?
তাহা হ'লে তুই তবে মাতা ন'স্ কোনোমতে,
রাক্ষসী পিশাচী তুই, এসেছিস্ ছেলে খেতে !
আমি মা গো ছোটছেলে, জননীর স্নেহাধান !
ছিনায়ে এনেছে মোরে দেবে বলে বলিদান !
কি আর কহিব তোরে, এ বিপদে রক্ষা কর !
ছেড়ে দে মা, ফিরে যাব, এই শুধু চাহি বর।
অভয়া, অভয়া হয়ে ভয়ার্ত্তেরে দে মা ত্রাণ !
যতদিন বেঁচে র'ব গা'ব তোর জয়গান ॥"

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভয়।

মরণের ভেরী শুনে রে অবোধ—
শঙ্কিত তোর চিত্ত !
মৃত্যু-রাজের দণ্ড দেখিয়া
শিহরি উঠিস্ নিত্য !
কি যে অমরতা মরণের মাঝে,
কি যে আশ্বাস ঐখানে রাজে !—
ও নহে মরণ—জীবনের শেষ—!
তবে কেন তোর চিত্ত,
মৃত্যুর ঘন কাল ছায়া দেখি
শিহরি উঠিছে নিত্য ?

মরণ সে নহে জীবনের লয়,
নহে জীবনের সাঙ্গ ;
মৃত্যু সে আসি জীবনের খেলা—
করে না-ক কভু ভঙ্গ।

সে আসিয়া কভু জীবনের খেলা,
ভেঙ্গে নাহি দেয় মরতের মেলা ;
সে আসিয়া কভু জীবনের সাথে
করে না নিঠুর রঙ্গ,
মরণ আসিয়া জীবনের খেলা
করে না-ক কভু ভঙ্গ।

মৃত্যু সে যে রে জীবনের সাথে
স্নেহ-শৃঙ্খল-বদ্ধ ;
সে যে জীবনের মাঝখানে আছে—
চিরদিন অবরুদ্ধ !
মৃত্যু নহে রে জীবনের শেষ ;—
নব-জীবনের নব উন্মেষ !—
ফুটে উঠে ঐ দামামার তালে
হোথা উঠে তার শঙ্খ !

মৃত্যু সে যে রে জীবনের সাথে
স্নেহ-শৃঙ্খল-বদ্ধ।
মৃত্যু সে করে নব-জীবনের,
নব-গঠনের সৃষ্টি!
ওরে অবোধ! বারেক সে-দিকে
ফিরারে ও তোর দৃষ্টি!
মরণের মাঝে ঐ শুনা যায়—
নব-জীবনের নব পরিচয়!
সে রোষ-কুটিল নয়ন মেলিয়া
করে না অনল বৃষ্টি;
সে সদাই ঐ করুণ নয়নে
করিছে অভয় দৃষ্টি!

তবে কেন ওরে অবোধ অন্ধ,
শঙ্কিত তোর চিত্ত?
তবে কেন তুই মরণের নামে
শিহরি উঠিস্ নিত্য?
মরণ সে শুধু জীবনের পরে
নব জীবনের নব বেশ ধরে;
আসে ফিরে ফিরে,
চলে যায় পুনঃ
এমনি করিয়া নিত্য!
এ সকল দেখি তবু রে অবোধ,
শঙ্কিত কেন চিত্ত?

আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তাপ ও আলোক।

তাপ ও আলোকের ভাণ্ডার সূর্য্য। এই সূর্য্যের কথা একটু বলি। সূর্য্য আমাদের বহুদূরে আছেন। তিনি এত দূরে না থাকিলে আমরা তাঁহার তেজ সহ্য করিতে পারিতাম না। সূর্য্য পৃথিবী হইতে নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে। পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, যে রেলগাড়ী ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল চলিতে পারে, সেই রেলগাড়ীর পৃথিবী হইতে সূর্য্যে পৌঁছিতে ৩৫৩ বৎসর লাগে। মানুষের পরমায়ু হারাহারি ৭০ বৎসর ধরিলে, ৫ পুরুষ লাগে। এইরূপ দ্রুতগামী গাড়ী পৃথিবীকে এক মাসে ঘুরিতে পারে, কিন্তু সূর্য্যকে ঘুরিতে তাহার দশ বৎসর লাগে। আমাদের পৃথিবী যেমন লাটিমের মত ঘোরে, সূর্য্যও সেইরূপ ঘোরেন্। পৃথিবীর লাগে ২৪ ঘণ্টা; সূর্য্যের লাগে ২৫ দিন। এখন ভেবে দেখ, সূর্য্য আমাদের পৃথিবী হইতে কত বড়! পৃথিবীর চারিদিকে যেমন আকাশ (Atmosphere) আছে, সূর্য্যের চারিদিকেও সেইরূপ আকাশ (Photosphere) আছে। এই আকাশ জ্যোতিঃ এবং তেজে পূর্ণ। আমাদের আকাশ ২৫ মাইল ঘন, সূর্য্যের আকাশ ৫০০০০০ (পাঁচ লক্ষ) মাইল ঘন। সূর্য্য 'Photosphere' সহ আমাদের পৃথিবী হইতে এক কোটি ত্রিশলক্ষ গুণে বড়।

সূর্য্যেতে এত তাপ যে, সেখানে সমস্ত পদার্থ বাষ্প হইয়া যায়। এই বাষ্প অগ্নিময়। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ এমন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা সূর্য্যের উপাদান

জানিতে পারা যায়। সূর্য্যের উপরিভাগের একবর্গ গজ হইতে যে রৌদ্র বাহির হয়, তাহা ছয় 'টন' পরিমাণের তাপের সমান। ১টন প্রায় ২॥ মণ। সূর্য্যের আলোকষ্ঠ বা কর্ত চূণের গোলা Hydrogen এবং Oxygen মিশ্রিত অগ্নিশিখায় পোড়াইলে এমন আলো হয় যে, আমরা তাহা সহ্য করিতে পারি না। এমন উজ্জ্বল গোলা সূর্য্যের সম্মুখে ধরিলে একটি কাল গোলার মতন দেখায়।

সূর্য্য-কিরণ সৌরজগতের সর্ব্বত্র বিতরিত হইতেছে। সেজন্য আমাদের পৃথিবী অপেক্ষাকৃত অতিশয় অল্প তেজ পায়। সূর্য্যের তেজকে যদি দুইশত সাতাশ মিলিয়ন অর্থাৎ বাইশ কোটি সত্তর লক্ষ ভাগে বিভক্ত করা যায়, তবে তা'র মধ্যে পৃথিবী একটি ভাগমাত্র পায়।

সূর্য্যের দ্বারা আমাদের কি উপকার হয় ? আমরা সকলেই মোটামুটি জানি, সূর্য্য আলোক ও বাষ্প দেন ; কিন্তু এ বিষয়ের বৃত্তান্ত সকলে জানে না। আলোক এবং উত্তাপ ব্যতীত কোন জীব বা উদ্ভিদ্ বাঁচে না। যেখানে যতপ্রকার তাপ আছে, কি আমাদের শরীরে, কি আমাদের বাহিরে, সে সমস্তই সূর্য্য-তেজের অংশ। এই তেজ আমাদের রক্ত পরিষ্কার করে এবং সমস্ত শারীরিক-যন্ত্র-চালনায় সহায়তা করে। সূর্য্যতেজে ও আলোকের ফলে উদ্ভিদের এমন নয়নতৃপ্তিকর সবুজবর্ণ হয়। এই বর্ণ আমাদের জীবনের বহু উপকারী। সূর্য্যতেজের chemical বা রাসায়নিক শক্তির দ্বারা carbonকে oxygen হইতে বাহির করিয়া উদ্ভিদ্ এবং জীবের জীবন রক্ষা হয়। আমাদের দেহযন্ত্র সূর্য্যের শক্তিতেই চলে।

আহা! আমাদের মত ক্ষুদ্রপ্রাণীর জন্য কৃপাময় বিধাতা এতবড় বিশাল সূর্য্য এবং সৌরজগৎ সৃষ্টি করেছেন ?

"তাঁর গুণে পূর্ণ জগৎ, ব্রহ্মাণ্ড যাঁর মহিমা !
প্রকাশে জগৎ তাঁর মহিমার কণিকা।"

আলোক।

যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য খাইলে আর পরিষ্কার বায়ু সেবন করিলেও আলোকের অভাবে আমরা সুস্থ ও সবল থাকিতে পারি না। আলোক ও উত্তাপ পরস্পর সংযুক্ত। সেইজন্য ঘরের দীপ নিবাইলে ঘর ঠাণ্ডা হয় ; আলোকের অভাবেই রাত্রি দিন অপেক্ষা ঠাণ্ডা।

মাঠে দূর্ব্বা-ঘাসের উপর একখানা ইট রাখিয়া কয়েক দিন পরে তাহা তুলিয়া দেখিলে, দেখা যায় যে, ঘাসগুলি হল্‌দে বা ফ্যাকাসে-বর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঘাসগুলা অনেক দিন চাপা থাকিলে একেবারে মরিয়া যায়। যে-সকল গাছ ও শাকসব্জি আওতায় পড়ে, সেগুলা একেবারে মরিয়া না গেলেও, ভালরূপ হয় না। অন্ধকার ঘরে বা সঙ্কীর্ণ সহরে যাহারা বাস করে, তাহারা পাণ্ডুবর্ণ হয়। পূর্ব্বকালে বন্দীদিগকে জমির মধ্যে অন্ধকার ঘরে রাখা হইত। তাহারা খাদ্য এবং বাতাস পাইয়াও শীঘ্র মরিয়া যাইত। অন্ধকার ঘরে থাকিলে কেবল যে বর্ণ বিবর্ণ হয়, তাহা নয় ; সমস্ত শরীর দুর্ব্বল হয় এবং রোগ-প্রবণতা বাড়ে।

আলোকের অভাবে এরূপ কেন হয় ? গাছ বাতাস হইতে Carbonic Acid এবং ভূমি হইতে লবণ ও জল লইয়া আপনার দেহ গঠিত করে। প্রথমে 'কারবন'কে

(কয়লা) চিনি করে; চিনির দ্বারা গাছের কাষ্ঠ ইত্যাদি তৈয়ারি হয়। এই জন্য সকল গাছের মধ্যে এত (starch) শ্বেতসার। শ্বেতসার পুড়ালে চিনি হয়। চিনি করিবার কল—গাছের সবুজ পাতা। অণুবীক্ষণ-যন্ত্রদ্বারা গাছের পাতা দেখিলে দেখা যায় যে, পত্রের কতক অংশে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলা আছে। এই গোলাগুলিই চিনি করিবার কল। সূর্য্যালোক এই কলকে নির্ম্মাণ করে এবং চালায়। গাছের সবুজবর্ণ বাতাস হইতে Carbon লইয়া oxygen ছাড়িয়া দেয় বলে, বাতাস পরিষ্কার হয় এবং উহা আমাদের দেহের নানাপ্রকার কাজ করে।

যেমন গাছ-সম্বন্ধে তেমনি আমাদের রক্ত-সম্বন্ধেও সূর্য্যালোকের প্রয়োজন। রক্তে (serum) সিরম আছে। 'রিষ্টারের' ফোস্কা গলে যে প্রকার রস বাহির হয়, সিরম সেই প্রকার। এই সিরমে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল গোলা এবং অল্পসংখ্যক সাদা গোলা আছে। লাল গোলার বর্ণই রক্তের বর্ণ। যে রোগ-বীজ আমাদের শরীরে প্রবেশ করে, সাদা গোলাগুলি তাহা নষ্ট করে। রক্তের বর্ণ যতই লাল হয়, ততই ভাল। রক্তবর্ণই আমাদের মাংস ও ত্বকের বর্ণ। সূর্য্যের আলোক আমাদের শরীরে পড়িলে, আমাদের শরীর এক প্রকারে উত্তেজিত হইয়া লাল রক্ত তৈয়ারি করে। লাল রক্ত ব্যতীত খাদ্যদ্রব্য ভাল জীর্ণ হয় না এবং আমাদের নিঃশ্বাসের ঠিক্ রকম কাজ হয় না। সেজন্য আমরা দুর্ব্বল হই এবং আমাদের বর্ণ পাণ্ডু হয়। যথেষ্ট পরিমাণে সূর্য্যালোক ও তাপের প্রয়োজন। কিন্তু অতিশয় আলোক বা তেজ মহানিষ্টকর। এমন কি সময়ে সময়ে তাহাতে আমরা মরিয়া যাইতে পারি।

শ্রীরাজমোহন বসু।

কি নাই আমার?

১

কি নাই আমার প্রভো! কি নাই আমার?
দিলে প্রিয় পরিজন, সহায়-সম্বল-ধন,
যতন-সোহাগ-স্নেহ নিকটে সবার;—
তা'র বেশী ও-চরণে কি চাহিব আর?

২

কি নাই আমার প্রভো! কি নাই আমার?
দিলে রম্য সুশোভন, কি প্রাসাদ অতুলন,
দাসদাসী জগণন নিতে সেবা-ভার;—
তা'র বেশী ও চরণে কি চাহিব আর?

৩

কি নাই আমার প্রভো! কি নাই আমার?
মিটাতে প্রবল তৃষা, রহে প্রাণে ভালবাসা;
সন্তোষ-সান্ত্বনা দিলে আরাম অপার;—
তা'র বেশী ও-চরণে কি চাহিব আর?

৪

কি নাই আমার প্রভো! কি নাই আমার?
করিলেও এত দান, সবি ভগ্ন, সবি ম্লান!
দাও নি "জীবন" যে গো যা' রহে সবার!—
"সার্থক-জীবন" বিনা নাহি চাহিবার।

৺হেমন্তবালা দত্ত।

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

লাবপুর।

ইহা বীরভূম-জেলার সিউড়ী-মহকুমাভুক্ত একটী গ্রামমাত্র। আদমপুর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ইহা প্রায় ৭ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানকার লোক-সংখ্যা ৭৫০। এখানে একটী এন্‌ট্রেন্স স্কুল, একটী মাইনর স্কুল, একটী বালিকা-বিদ্যালয়, একটী সংস্কৃত টোল, একটী চিকিৎসালয়, সব-রেজেষ্টারি অফিস, পুলিস ষ্টেশন এবং পোষ্ট-অফিস্ আছে। গ্রামটী পীঠস্থান বলিয়া পরিগণিত। প্রবাদ এইরূপ যে, সতীর ওষ্ঠাধর এখানে পতিত হয়। এখানকার ফুল্লরাদেবীর মন্দির অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এই মন্দিরের সংলগ্নীভূত একটী স্থানে শৃগালগণকে আহার দেওয়া হয়। জীবের প্রতি হিন্দুদিগের কিরূপ দয়া, তাহাই দেখাইবার জন্য, বোধ হয়, শিবা-ভোগ হইয়া থাকে। ভাতই ভোগের উপকরণ। শৃগাল যাহা খাইতে না পারিয়া ফেলিয়া রাখে, তাহাই হিন্দুগণ প্রসাদ বলিয়া ভক্ষণ করে। শৃগালগুলি একপ্রকার পোষা বলিলেই হয়। রূপী সুপী বলিয়া ডাকিলেই তাহারা সন্নিকটবর্ত্তী জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া নিকটে আগমন করে। মন্দিরের সন্নিকটে ৩০০ বিঘা জমি লইয়া একটী শুষ্ক হ্রদ আছে। ইহা 'দল-দল'-নামে খ্যাত। ইহার কোনও স্থানের উপর দণ্ডায়মান হইলে অনেকটা স্থান স্পন্দিত হইতে থাকে বলিয়া ইহার নাম 'দল-দল' হইয়াছে। প্রবাদ এইরূপ যে, ইহাই রামায়ণোক্ত দেবী-দহ। এইস্থান হইতেই রামচন্দ্র নীলপদ্ম লইয়া দুর্গা-দেবীর পূজা করেন।

নলহাটী।

বীরভূম-জেলার অন্তঃপাতী রামপুরহাট-মহকুমার ইহা একটী গ্রামমাত্র। লোক-সংখ্যা ২৬৩৬। এখানে একটী পুলিস ষ্টেশন, সব-রেজেষ্টারী অফিস, মধ্যবৃত্তি বিদ্যালয়, ইন্‌স্পেকসন বাঙ্গালা এবং দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। স্থানটী চালের মণ্ডী। চালের ব্যবসায় ব্যতীত এস্থানে কাঁসা ও পিত্তলের দ্রব্যাদিরও ভূরি বিক্রয় হইয়া থাকে। প্রবাদ এইরূপ যে, ইহা রাজা নলের রাজধানী ছিল। অদ্যাপি রাজধানীর ভগ্নাবশেষ সহরের সন্নিকটে 'নলহাটী জীলা'-নামক একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর দৃষ্ট হয়। এখানে মুসলমানগণের সহিত হিন্দু রাজার ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। পাহাড়ের নিম্নভাগে একটী শীতল নির্ঝরিণী আছে। অপর প্রবাদ এই যে, সতীর কণ্ঠদেশ এখানে পতিত হয় বলিয়া ইহার নাম 'নল' হইয়াছে। এখানকার মন্দিরটী 'ললাটেশ্বরী'-নামে খ্যাত। অন্য প্রবাদ এই যে, সতীর ললাটদেশ এস্থানে পতিত হয়। যাহা হউক্, স্থানটী যে পীঠস্থান তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কিরীটেশ্বরী।

মুর্শিদাবাদ-জেলার লাল-মহকুমায় ভাগীরথীর পশ্চিমে এই গ্রাম অবস্থিত। এখানে কিরীটেশ্বরীর মন্দির আছে বলিয়া সেই নামে গ্রামটীর নামকরণ হইয়াছে। এখানে সতীর কিরীট পতিত হয়। ভবিষ্য পুরাণে ব্রহ্মাণ্ড খণ্ডে এ বিষয়ের উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কিরীটাস্থিটী লাল রেশম দ্বারা

আচ্ছাদিত থাকে। সুতরাং, লোকে তাহা দেখিতে পায় না। এখানে অনেকগুলি মন্দির আছে, তন্মধ্যে একটীতে ১৭৬৫ খৃ খোদিত আছে। মন্দিরগুলির সংস্কার আবশ্যক।

জল্পেশ।

ইহা জলপাইগুড়ি-জেলার দক্ষিণে ময়নাগুড়ি পরগণার একটী গ্রামমাত্র। লোক-সংখ্যা ২০৮৮। এখানে শিবের মন্দির অবস্থিত। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাণনারায়ণ-নামক জনৈক কুচবিহারের রাজার দ্বারা যে পুরাতন মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই স্থানের উপর উক্ত মন্দিরটী প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটী অত্যন্ত বৃহৎ ও সুন্দর। উপরের খিলানটীর ব্যাস ৩৪ ফিট। মন্দিরটী করোদা-নদী-তটে অবস্থিত এবং খাত-দ্বারা পরিব্যাপ্ত।

এখানকার শিবলিঙ্গটী অনাদি বলিয়া কালিকা-পুরাণে উক্ত হইয়াছে। শিবরাত্রের সময় এখানে একটী মেলা হয়। মেলাটী তিন সপ্তাহ থাকে। জেলার সকল স্থান হইতে এই মেলায় লোক সমাগত হয়। এতদ্ব্যতীত রংপুর, দিনাজপুর হইতেও লোক আসিতে দেখা যায়। ভুটিয়াগণ দার্জ্জিলিং, বক্সা এবং ভুটান হইতে কাপড়, কম্বল, টাট্টু এবং চামড়া বিক্রয়ার্থ লইয়া আসে এবং কার্পাস, উলীবস্ত্র, পান এবং তামাক ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। মেলাটী খুব জাঁকাল হইয়া থাকে।

বক্সর-(বাঘসর)।

ইহা সাহাবাদ-জেলার একটী সহরমাত্র। ইহা গঙ্গানদী-তটে অবস্থিত। লোক-সংখ্যা ১৩৯৪৫। স্থানটী কলিকাতা হইতে ৪১১ মাইল দূরবর্ত্তী। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে দ্বারা যাত্রিগণ বক্সরে যাইয়া থাকে। সহরটী বাণিজ্যের কেন্দ্র।

বেদ-প্রণেতা অনেক ঋষিই বক্সরে বাস করিতেন বলিয়া ইহার পৌরাণিক নাম 'বেদগর্ভ'। অন্য প্রবাদ এই যে, বক্সর-নামটী 'অঘসর' নাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অঘসর-নামে এখানে একটী পুষ্করিণী আছে। অঘসরের অর্থ পাপ-বিমোচক। কালে অঘসর বঘসরে পরিণত হইয়াছে। অন্য কিংবদন্তী এই যে, বেদসীরা নামে জনৈক ঋষি দুর্ব্বাসা'কে ভীত করিবার নিমিত্ত ব্যাঘ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন কিন্তু দুর্ব্বাসার শাপে তাঁহাকে সেই ব্যাঘ্র-মূর্ত্তিতেই থাকিতে হয়। অনন্তর তিনি অঘসরে স্নান করিয়া গৌরীশঙ্করের পূজা করিলে স্বীয় পূর্ব্বরূপ ধারণ করেন। পরন্তু তিনি স্বীয় ব্যাঘ্রমূর্ত্তি-পরিগ্রহের স্মৃতি রাখিবার জন্য স্থানটীকে 'ব্যাঘ্রসর' বা 'বাঘসর'-আখ্যা দেন। বক্সরের নানা স্থান নানা নামে খ্যাত। যথা—রামেশ্বর, বিশ্বামিত্রের আশ্রম এবং পরশুরাম। এখানকার রামেশ্বর-নাথ মহাদেবের একটী বিখ্যাত মন্দির আছে। দূর দূর হইতে লোকে এখানে তীর্থ করিতে আসে।

বকসরে অযোধ্যার নবাব উজির সুজাউদ্দৌলা এবং বঙ্গের স্বাধীন নবাব মীরকাসিম পরাজিত হ'ন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

পরিচয়।

এবার তোমারে চিনেছি হে প্রিয়,
চিনেছি তোমারে আমি ;
তুমি সীমার মাঝারে অসীম হইয়া
সম্মুখে আসো গো নামি !
তুমি বিরহ-ব্যথিত হৃদয়ে আমার
হঠাৎ কখন আসি,
অন্তর-মাঝে গোপন থাকিয়া
বহু কথা ভালবাসি !
তুমি মথিত কর গো হৃদয় আমার
দারুণ আঘাত দিয়া,
তুমি অন্তর-মাঝে তুষানল জ্বাল
পূত করিবারে হিয়া !
তুমি নির্ম্মল নীল শরদ্-গগনে
চন্দ্রকিরণে ভাস ;
মধুমাসে তুমি দখিন পবন
বেয়ে বেয়ে কাছে আস !
রক্ত রঙীন ফাগুয়ার মত
উদয়-অচল হ'তে,
পূর্ব্ব তোরণে হাসিয়া দাঁড়াও
সোনার কিরণ সাথে !
গোধূলির ধূলি মাখিয়া তুমি গো
দেখাও কতই রঙ্গ ;
শেষে সন্ধ্যার মাঝে লুকাইতে চাও
আঁধারে আবরি অঙ্গ !
সেই সে তুমি গো অন্তরে মোর
আছ অন্তরযামী,
এবার তোমারে চিনেছি হে প্রিয়,
চিনেছি তোমারে আমি।

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২১)

সমস্ত দিনটা নানা গোলমালে কাটিয়া গেল। নমিতা কেবল ভাবিতে লাগিল, কাল বাদ পরশু, আবার সেই হাঁসপাতালে গিয়া পুরাতন কাজে নিযুক্ত হইতে হইবে। ছিদ্রান্বেষী 'মান্যবর'-গণের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিবার জন্য সতর্ক ভাবে চক্ষু-কর্ণ রুদ্ধ করিয়া, নিতান্ত নিরীহ জন্তু সাজিয়া, অকাতরে সব উৎপাত সহিয়া যাইতে হইবে! কি চমৎকার কর্ত্তব্য-পালন! মূক-অস্বস্তি-পীড়নে, তাহার অসহায় ক্লান্ত মনটা এক এক সময় নিরুপায় ক্ষোভে জিঘাংসায় উদ্দৃপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। নমিতার মনে হইতেছিল, 'আঃ, ভাগ্য-বশে আজ যদি কোন একটা কর্ম্মখালি-বিজ্ঞাপন'-দাতার ঠিকানা হইতে হঠাৎ নিয়োগ-পত্র আসিয়া পড়ে, তবে বড় সুবিধাই হয়! ডাক্তারসাহেবকে একটি কথা জানাইবার অপেক্ষামাত্র :—আমার ইস্তফা গ্রহণ করুন।' ব্যস্ তারপর এক মুহূর্ত্তও কালক্ষেপ নয়। এই খল-স্বভাব মানুষগুলার সংস্রব এড়াইয়া হাপ ছাড়িয়া সে বাঁচে! যমালয়ের নূতনত্বও আজ নমিতার কাছে শ্রেয়স্কর, যদি এই

পুরাতন-পীড়নের সীমা ডিঙ্গাইয়া সে যাইতে পারে!

সন্ধ্যার পরে মা'র ঘরের মেঝেয় মাদুর বিছাইয়া বসিয়া সমিতা ও সুশীলকে পড়াইতে পড়াইতে নমিতা অন্যমনস্ক হইয়া ঐ সব কথা ভাবিতেছিল। এইরূপ সময় বাহির হইতে লছ্‌মীর-মা ইসারা করিয়া তাহাকে ডাকিল। নমিতা উঠিয়া যাইতেই লছ্‌মীর মা প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া, চুপি চুপি বলিল, 'মা'র রাত্রে খাইবার দুধ্‌টুকু সব বিড়ালে খাইয়া গিয়াছে। এখন উপায়? মা ত শুনিতে পাইলে আর কিছু খাইতে চাহিবেন না! কিন্তু তাঁহার মত রুগ্ন দুর্ব্বল মানুষকে অনাহারে রাখা সম্পূর্ণ অনুচিত। সুতরাং, একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে যে!'

পুরাতন চাকরীতে ইস্তফা দেওয়া এবং নূতন চাকরীতে বাহাল হওয়ার যত কিছু কল্পনা-বিপ্লব চকিতে নমিতার মস্তিষ্ক হইতে অন্তর্হিত হইল। হতবুদ্ধি হইয়া সে বলিল, "মা'র দুধ্‌! সর্ব্বনাশ! না লছ্‌মীর মা, মা'র দুধ চাই-ই। যেমন করে হোক্‌ যোগাড় কর।"

লছ্‌মীর মা শঙ্কর-চাকরকে ডাকিল। সে বলিল, "নগদ পয়সা পাইলে এখনই সে যেরূপে হৌক্‌, দুগ্ধ আনিয়া দিতে পারে।"

মা'র কাছে ঐ সামান্য পয়সার জন্য মিথ্যা কথা বলিতে যাওয়ার ইচ্ছা নমিতার হইল না, কিন্তু তাহার নিজের কাছে যে পাই-পয়সাও একটি অবশিষ্ট নাই, তাহাও খুব ভাল করিয়া তাহার মনে পড়িল। তবুও কি জানি, যদি কোনও দিনের কিছু খুচ্‌রা জমা বাক্সটায় পড়িয়া থাকে! এই ভাবিয়া সংশয়ে উদ্বিগ্ন নমিতা বলিল, "আলোটা একবার দেখাও, লছ্‌মীর মা! বাক্সটা খুল্‌বো।

স্বীয় শয়নকক্ষে আসিয়া নমিতা হাত-বাক্সটা খুলিল; দেখিয়া বলিল,—'কিছু নাই, কিছু নাই!' যখন যাহা পায়, তখনই হিসাব বুঝাইয়া মা'র হাতে সে সব সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হয়! নিজের খরচ বলিয়া, বা হঠাৎ যদি দরকার পড়ে বলিয়া, কখনও ত এক পয়সা সে সরাইয়া রাখে নাই। পাছে মা'র হাত-খরচে অকুলান পড়ে, পাছে তাঁহার অসুবিধা হয়, ইহাই ভাবিয়া নমিতা সঙ্কুচিতা হইয়া থাকে; নিজের প্রয়োজনের কথা কখনও ভাবিবার সময় পায় নাই। আজ সহসা এ যে অপ্রত্যাশিত ব্যাপার!

নিজেকে মূর্খ, নির্ব্বোধ, অর্ব্বাচীন, অপরিণামদর্শী—যা ইচ্ছা তাই বলিয়া মনে মনে গালি দিয়া, সমস্ত বাক্সটা ওলট্‌ পালট্‌ করিয়া দেখিতে দেখিতে, কাগজপত্রের সহিত ডাক্তার মিত্রের স্ত্রীর দেওয়া সেই নোট-দুইখানি নমিতার হাতে উঠিল।—নমিতা অবাক্‌ হইয়া গেল! সে-দিন সে এই বাক্স'র মধ্যে কখন্‌ নোট-দুইখানা রাখিয়াছে, কিছুই মনে নাই! নোটের কথাই যে একেবারে সে ভুলিয়া গিয়াছে!

নোট-দুইখানা চোখের সাম্‌নে তুলিয়া ধরিতে নমিতার সাহস হইল না। একখানা কাগজ টানিয়া তাহার উপর চাপা দিয়া, নিঝুম হইয়া সে ভাবিতে লাগিল। বুকের ভিতর কি যেন একটা ভয়ঙ্কর গুরুভার বস্তু, সবেগে তোলাপাড়া হইতে লাগিল!

খানিকটা পরে, সহসা মুখ তুলিয়া অস্বাভাবিক বিকৃত কণ্ঠে নমিতা বলিল, "লছ্‌মীর মা, আজকের মত ঐ ক'টা পয়সা

কারো কাছে ধার নিতে পার?—" নমিতার কণ্ঠস্বর জড়াইয়া গেল। সে মুখ নত করিল।

বহুদিনের পুরাতন-বিশ্বাসী লোক লছ্‌মীর মা অতি-শৈশব হইতে নমিতাকে নিজ-হাতে মানুষ করিতেছে। এই সংসারের সমস্ত সুখ-দুঃখের সহিত তাহার জীবন-স্রোত এক সঙ্গে মিশিয়া বহিয়া যাইতেছে।—এই সংসারের প্রাণীগুলির সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট আছে। লছ্‌মীর মা নমিতার ভাব দেখিয়া অবস্থা বুঝিল; মনের দুঃখ মনে চাপিয়া, হাসি-মুখে গর্ব্বিতভাবে বলিল, 'তার জন্য কি হইয়াছে? আমার ভাঙ্গা-তোরঙ্গটা খুঁজিলে পুরাতন কাপড়-চোপড়ের সহিত এখনই অমন দুই দশ আনা খুচ্‌রা পয়সা পাওয়া যাইবে। এতক্ষণ বলিতে হয়!"

আলো রাখিয়া লছ্‌মীর মা চলিয়া গেল। সে পয়সা যোগাড় করিতে পারিল কি না, তাহা জানিতে যাইবার শক্তি বা সাহস কিছুই নমিতার জুটিল না। নমিতার বেশ মনে হইল লছ্‌মীর মা'র হাতে একটি পয়সা নাই। তাহার মাহিনার টাকা ত মাসে মাসে পোষ্ট অফিসে বিমল জমা দিয়া ফেলে। খুচরা পয়সা আসিবে কোথা হইতে?.....শুধু নমিতাকে আশ্বস্ত-করিবার জন্যই, বোধ হয়, সে নিজের সঞ্চয়-সম্বন্ধে এত জোরে 'মুখ-সাপট' করিয়া গেল। এইবার নিশ্চয় শঙ্কর-ঠাকুর বা গোরী-পাঁড়ের নিকট ধার লইবে। ছিঃ! কি লজ্জা! এত দৈন্যগ্লানি!...হে ভগবন্, এ কি লাঞ্ছনা!

নমিতা বড় দুঃখে নীরব হাসি হাসিল! দর্পহারী নারায়ণ এই ত দর্প চূর্ণ করিলেন! কতটুকু শক্তি দিয়া যে তিনি তাহার মত ক্ষুদ্র জীবকে সংসারে পাঠাইয়াছেন, তাহার ওজনএই এক অভাব-সংঘাতে পরিষ্কার করিয়া দেখাইলেন্ নয় কি? সে দুর্ব্বল, অক্ষম,—জগতের নগণ্য জীব! গণ্যমান্য ক্ষমতাশীল ব্যক্তির অন্যায় তাহাকে নীরবে সহিতে হইবে; সহিতে সে বাধ্য! ইহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠা, তাহার পক্ষে অপরাধ! অপরাধ! মহাপরাধ!

মনের অবস্থাটার সংশোধন না করিয়া মা'র ঘরে যাওয়া চলে না। নমিতা পড়িবার ঘরে আসিয়া চেয়ারটা টানিয়া লইয়া বসিল। বিমল এখনও বেড়াইয়া আসে নাই। টেবিলের উপর আলো জ্বলিতেছিল। একখানা বই টানিয়া লইয়া নমিতা পড়িতে সুরু করিল।

একটু পরে বারেণ্ডায় জুতার শব্দ হইল। বিমল আসিবে বলিয়া তখনও বাহিরের দুয়ারে খিল বন্ধ করা হয় নাই। কে যেন দুয়ার ঠেলিয়া বাহিরের ঘরে ঢুকিল। নমিতা মনোযোগ দিল না; ভাবিল বিমলই হইবে। আগন্তুক ধীরে ধীরে আসিয়া, ঐ দিকের দ্বার ঠেলিয়া, সতর্কতা-জ্ঞাপক একটু শব্দ করিল।

"বিমল?"—বলিয়া নমিতা মুখ তুলিয়া চাহিল; দেখিল অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে এ-দিক্ ও-দিক্ চাহিয়া দত্তজায়া ঘরে ঢুকিতেছেন! এ কি অভাবনীয় ঘটনা! ত্রস্তে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমিতা সসৌজন্যে বলিল, "আসুন, আসুন, নমস্কার; সবাই ভাল আছেন্ ত?—"

গম্ভীর মুখে দত্তজায়া বলিলেন, "একলা বসে রয়েছ যে, আর কেউ নাই?—"

তাঁহার কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীতে স্পষ্টই বোধ হইল, তিনি যেন আর কাহারও উপস্থিতি-বিষয়ে খুব আশা করিয়া আসিয়াছিলেন!

সে নাই দেখিয়া, হতাশ হইতেছেন! নমিতা ইহার অর্থ বুঝিতে পারিল না; গোলে পড়িয়া থতমত খাইয়া বলিল, "মেজ-ভাই 'বল' খেল্‌তে গেছে; সমি-সুশীল, মা'র কাছে রয়েছে; পড়্‌ছে তারা।—আপনি বসুন্।"

নমিতা চেয়ারটা টানিয়া তাঁহার দিকে সরাইয়া দিল। দত্তজায়া বসিলেন না; তাচ্ছীল্য-ভাবে সেটা একটু ঠেলিয়া পিছু হটাইয়া দিয়া বলিলেন, "ক' দিন খবর পাই নি, তাই দেখ্‌তে এলুম, হাতটা কেমন আছে—?"

দত্তজায়ার এই অযাচিত আগমনটা নমিতাকে যেন এক মুহূর্ত্তে আনন্দে ও আশ্চর্য্যে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল; দত্তজায়ার প্রশ্ন শেষ হইতে না হইতে, সে সরলা বালিকার মত আগ্রহ-ভরা মুখে তাড়াতাড়ি হাতখানা সাম্‌নে বিস্তার করিয়া, সহাস্যে বলিল, "বেশ আছে। আজও ব্যাণ্ডেজ আছে; কাল থেকে মলম দেব, ভাব্‌ছি। তারপর, আপনি,—হাঁ, এ দিকে এখন কোথায় গেছ্‌লেন্?"

দ্বারের দিকে চাহিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া দত্তজায়া বলিলেন, "একটা 'কলে' গেছ্‌লুম, ডাক্তারবাবুও সঙ্গে ছিলেন।..... আমি বল্লুম, এর সঙ্গে দেখা করে যাই। তাই উনি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন্।"—

বিস্ময়ে চমকিয়া নমিতা বলিল, "সে কি! উনি বাইরে! বল্‌তে হয়!" তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর হইতে আলোটা তুলিয়া লইয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া সলজ্জ হাস্যে নমিতা দত্তজাকে বলিল, "আপ্‌নিও দয়া করে সঙ্গে আসুন্; একবার বস্‌তে বলবেন।"

একটু উপেক্ষার সহিত দত্তজায়া বলিলেন, "তিনি ঐ খানেই আছেন। তুমিই বল না!"

"কি—?" বলিয়া বাহিরের অন্ধকারের ভিতর হইতে অগ্রসর হইয়া ডাক্তার মিত্র টুপী খুলিয়া দ্বারসম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। স্বভাব-সিদ্ধ অতি প্রাস্তারী চালের মর্য্যাদা রাখিয়া ডান পা চৌকাঠের উপর তুলিয়া চকিত-কটাক্ষে গৃহমধ্যে চাহিয়া গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "কেউ নেই দেখ্‌ছি! একলা আছ? ঘরে ঢুকতে পারি?"

কথাটা পরিহাসের দিক্ হইতে গ্রহণ করাই উচিত, ভাবিয়া নমিতা বিনীত হাস্যে নমস্কার করিয়া বলিল, "অনুগৃহীত হ'ব। আসুন্, আসুন্।"

এমন মাননীয় অতিথির অভ্যর্থনার জন্য আরও অনেক বাক্যাড়ম্বর-কৌশল ব্যবহার করা উচিত; কিন্তু নমিতার অনভ্যস্ত রসনায় তেমন কিছু যোগাইল না। ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া এ চেয়ারটা এ-দিকে ও চেয়ারটা ও-দিকে টানিয়া ঠেলিয়া, বিব্রতভাবে অদ্ভুত হুটাপাটি বাঁধাইয়া, সে নিজেই নিজের আচরণে লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। বাস্তবিক এ-সব রীতি-বদ্ধ অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন-প্রথা নমিতা সবই ভুলিয়া গিয়াছে। পিতার মৃত্যুর পর হইতে গৃহে অতিথি-সমাগম বন্ধ হইয়াছে। কখন 'ডাক' দিবার জন্য কোন ভদ্রলোক আসিলে, বিমলই নমিতার 'মুস্কিল আসান' হইয়া দাঁড়ায়; আজ এই স্বাগত-সম্ভাষণের প্রয়োজন মুহূর্ত্তে, নিজের অপটুতার সহিত বিমলকুমারের ক্ষমতার উপর নমিতার মনে মনে বেশএকটু শ্রদ্ধা সম্ভ্রমের উদয় হইল। কোন রকমে অত্মসংবরণ করিয়া ত্রুটির জন্য

কথা চাহিয়া দত্তজায়াকে সে হাত ধরিয়া চেয়ারে বসাইল। ডাক্তার মিত্র টুপিটা টেবিলে রাখিয়া অন্য চেয়ারে হেলান দিয়া বসিলেন। গম্ভীর ভাবে চারিদিকে চাহিয়া গৃহসজ্জা দেখিতে দেখিতে তিনি বলিলেন, "হাতটা কেমন আছে, মিস্ মিত্র? ঘা শুকিয়েছে বেশ?"

দত্তজায়ার চেয়ারের পাশে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া নমিতা সবিনয়ে বলিল, "অনেকটা শুকিয়েছে।"

মনে মনে নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাকে শত সহস্র ধিক্কার দিতে দিতে নমিতা ভাবিল, ছিঃ, এই শিষ্টস্বভাব ভদ্রলোকটির বিরুদ্ধে কত কথাই সে মনে স্থান দিয়াছে! বুদ্ধির ত্রুটি ধরিয়া কেহ তাহাকে 'ছেলে মানুষ' বলিলে নমিতা রুষ্ট হয় বটে, কিন্তু সে-রাগ নিতান্তই ন্যায়-বিগর্হিত! এই ত তাহার ছেলে-মানুষীর প্রমাণ হাতে হাতে ধরা পড়িল! সত্যই ত, কখন্ কি ক্ষেত্রে, কি একটু সদ্ব্যবহারের ত্রুটি করিয়াছেন বলিয়া, ভদ্রলোক কি তাহাই ধরিয়া বসিয়া আছেন? তাঁহার কি অন্য কাজ নাই? নিশ্চয়ই তিনি গোলমালে তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন! নমিতারই দোষ! সে নিজের সঙ্কীর্ণ মনের মধ্যে, রাজ্যের জঞ্জাল জড় করিয়া, উন্মাদ-বিপ্লবে ধূলা ছড়াইয়া নিজের চোখে-মুখে মাখিতেছে, আর পরের দোষ আবিষ্কার করিয়া নানাবিধ কাল্পনিক অসন্তোষের সৃষ্টি করিতেছে। কি দুর্ভাগ্য!

টেবিলের উপর হইতে কলমটা তুলিয়া লইয়া একটুকরা কাগজে কালীশূন্য নিব্‌টা খচ্ খচ্ করিয়া বুলাইতে বুলাইতে, ডাক্তার মিত্র বিজ্ঞভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "গ্রহের ফের! একটা সামান্য ক্রুশ বিঁধে কি কষ্ট পাওয়া! আমি প্রায়ই মনে করি আস্‌ব; হ'য়ে উঠে না।—যে কাজের ভিড়!"

নমিতা দত্তজায়াকে লক্ষ্য করিয়া ব্যস্ত-ভাবে বলিল, "আপনারা এখন 'কল' থেকে ফির্‌ছেন? চা খাওয়া হয় নি বোধ হয়? একটু 'চা'য়ের বন্দোবস্ত করি, কি বলুন্?

বাধা দিয়া ডাক্তার মিত্র বলিলেন, 'না না, চায়ে কাজ নেই; বরং পান-টান্ থাকে ত দুটো দাও—।"

"এই যে আন্‌ছি,—" বলিয়া নমিতা বাড়ীর ভিতর দিকের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল; ক্ষণ-পরে ডিবা-শুদ্ধ পান আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল ও নিজে দুইটি পান তুলিয়া লইয়া দত্তজায়াকে দিল।

পান মুখে পূরিয়া দাঁতে করিয়া লবঙ্গ কাটিতে কাটিতে ডাক্তার মিত্র ঠিক্ যেন সম্মুখবর্ত্তিনী দত্তজায়াকেই লক্ষ্য করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "সে দিন এক মজা হয়ে গেছে। মিস্ মিত্রের হাতে ক্রুশ বিঁধে গেছে, তা কি আমি জানি? আমি ভাব্‌লুম রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে ওরা গল্প-সল্প কর্‌ছে, কথাবার্ত্তা কইছে;——ব্যাঘাত দেওয়া অনুচিত ভেবে পাশ কাটিয়ে চলে গেলুম। তাড়াতাড়িও ছিল। 'পোষ্ট-মর্টম কেস্' হাতে। কাজেই অত গ্রাহ্য করি নি; তা ছাড়া তেওয়ারী কম্পাউ-ণ্ডার ছিল ব'লে আমি আর দাঁড়ালুম না। তারপর ডাক্তার-সাহেবের ক্লার্কের কাছে শুনলুম, মিস্ মিত্র দরখাস্ত করেছে, সাত দিন ছুটি চাই। মিস্ স্মিথ্‌ও তা'তে 'সাপোর্ট' করেছেন।—এই সব ব্যাপার! তাই জান্-

লুম। নইলে কে জান্‌ত, মিস্ মিত্রের হাতে ক্রুশ বিঁধেছে—?"

দত্তজায়া অত্যন্ত ভালমানুষীর সহিত মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তা বৈ কি। না বল্লে আর মানুষ কি করে জান্‌বে? আমিই কি জান্‌তুম?—সেই বল্লুম্ আপনাকে; রাস্তায় হিতলালবাবুর সঙ্গে আস্‌ছিলুম্; নমিতাকে দেখে খেলা-পাগ্‌লা হিতলালবাবু তাস খেল্‌তে যাবার জন্য জেদাজেদি আরম্ভ কর্‌লে। তাঁকে জানেন ত? মান-অপমান জ্ঞান নেই! খেলার সঙ্গী হবার জন্য সবাইকে তিনি সাধেন; নমিতাকেও।—তা'পর ও রেগে উঠ্‌ল, মুখের উপর জবাব দিয়ে চলে এল; তখন ভদ্দরলোক থ' হয়ে গেলেন—।"

নমিতা অবাক্ হইয়া গেল! হঠাৎ এ কি সুর-বৈচিত্র্য!.....মনের মধ্যে অসহনীয় ক্রোধ-উত্তেজনা গর্জ্জিয়া উঠিল!— মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা,—সব মিথ্যা! ডাক্তার মিত্রের কথা মিথ্যা, দত্তজায়ার কথাও ত সব সত্য নহে! আশ্চর্য্য শক্তি! মুখে মুখে ইঁহারা এত মিথ্যা বানাইয়া বলেন কি করিয়া? নমিতার স্কন্ধে ইঁহারা যে-সব দোষ চাপাইতে চাহেন, সে-সকল মিথ্যা দোষকে নমিতা ভয় খায় না, কিন্তু মিথ্যা চাতুরী খেলিবার এই যে চেষ্টা,—ইহা নমিতা ঘৃণা করে, অত্যন্ত ঘৃণা করে! ডাক্তার মিত্র—শিক্ষিত ভদ্র-সন্তান—অম্লানবদনে এই ঘৃণার্হ মিথ্যায় যোগ দিলেন! আর দত্তজায়া! না। হে ভগবন্, ধৈর্য্য দাও! ইঁহারা গৃহাগত অতিথি! নমিতার রসনা আজ নীরব অসাড় হইয়া যাউক্।

নমিতার কপাল হইতে দর্ দর্ করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া কাঠের মত শক্ত হইয়া সে নত-দৃষ্টিতে নির্ব্বাক্ রহিল।

ডাক্তার মিত্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নমিতার মুখ-পানে চাহিয়া বলিলেন, "সুরসুন্দর তেওয়ারী, বুঝি, প্রত্যহ ড্রেস্ করতে আসে?—"

কণ্ঠ ঝাড়িয়া নমিতা উত্তর দিল, "সুর-সুন্দর নয়; সমুদ্রপ্রসাদ সিং আসেন।"

তীব্র ভ্রূকুটি করিয়া দত্তজায়া বলিলেন, "কি রকম? আজ আমি যে নিজে দেখেছি, সুরসুন্দর এসেছিল!"

ধীর স্বরে নমিতা বলিল, "হাঁ, শুধু আজ সমুদ্র সিংহের সঙ্গেই এসেছিলেন।—"

"যাই হোক্, এসেছিল ত?" এই বলিতে বলিতে ডাক্তার মিত্রের মুখপানে চাহিয়া দত্তজায়া একটু অর্থপূর্ণ বিদ্রূপের হাসি হাসিলেন। ডাক্তার মিত্রের অধরেও হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। পরক্ষণে গম্ভীর হইয়া টুপিটা টানিয়া লইয়া তিনি উঠিয়া দত্তজায়ার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আর নয়, এবার উঠে পড়ুন্—।"

দত্তজায়া উঠিলেন। শঙ্কর চাকর "তদ্দর আদ্‌নীদের" আগমন-সংবাদ শুনিয়া আলো দেখাইবার জন্য বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। সে দ্বার-সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিল। ডাক্তার মিত্র নমিতাকে শুনাইয়া শুনাইয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী দত্তজায়াকে বলিলেন, "কি জানেন? মিস্ স্মিথ্‌ই বলুন, আর সুর-সুন্দর তেওয়ারীই বলুন,—কাশীমিত্তি, নিম-তলা, সবাইকেই চিনি। যতই যা হোক্, ওঁরা আমাদের পর, বিদেশী; ওদের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠতা করতে গেলেই যে ঠক্‌তে

হবে, লোকে তাতে ঠাট্টা করতে ছাড়বে কেন?"

দত্তজায়া ততোধিক গাম্ভীর্যের সহিত বলিলেন, "তা তো বটেই!—আর শুধু পর? চিরদিনটা ইতর-সংসর্গে বাস! ওঁরা যে কি দরের মানুষ!

খুব একটা প্রকাণ্ড গূঢ়ার্থ-সূচক শ্লেষের হাসি হাসিয়া ডাক্তার মিত্র বলিলেন, "থাক্, থাক্, সে কথায় আর কাজ নাই। যাঁরা না জানেন্, তাঁদের কাছে আর ও-সব তোলা কেন?—চেপে যান্। আসি মিস্ মিত্র, নমস্কার!" তাঁহারা বাহির হইয়া গেলেন।

নমিতা বজ্রাহতের ন্যায় বসিয়া পড়িল। তাহার হাত পা থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। একটা বিশ্রী বিভীষিকার আতঙ্ক তাহার সর্ব্বশরীরে যেন অগ্নি-ঝলক্ ছড়াইয়া দিল। সমস্ত স্নায়ু-তন্ত্রীগুলা যেন যন্ত্রণায় অবশ হইয়া আসিতে লাগিল! হে ভগবন্, সে এ কি শুনিল! এ কি ভয়ঙ্কর, এ কি অসম্ভব কথা! মিস্ স্মিথের চরিত্র-সম্বন্ধে কুৎসিত-ইঙ্গিত! স্মিথ্ চিরদিন ইতর-সংসর্গে বাস করিয়াছেন! .....কি সাংঘাতিক বাণী! তাহা কি সত্য? তবে তিনি দেবতার মত অমন অমায়িক স্নেহভরা হৃদয় কোথা পাইলেন? অমন উদার উন্নত প্রাণ কোথা পাইলেন? মিস্ স্মিথের স্বভাব এত জঘন্য? তবে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ব্যবহার এত মনোরম, এমন শ্রদ্ধাকর্ষক, এত ভক্তিযোগ্য কেন? এ কি জটিল রহস্য!

হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া নমিতা গুম্ হইয়া ভাবিতেছিল। মা ঘরে ঢুকিয়া হাঁপানির টানে থামিয়া থামিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ডাকিলেন, "নমি,—অ-নমি!" চমকিয়া মাথা তুলিয়া মাকে দেখিয়া নমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল; সজোরে আত্মদমন করিয়া ব্যস্তভাবে বলিল, "আপ্নি এখানে কেন এলেন্? এত কষ্টে উঠা-হাঁটা করা!"

উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে নমিতার পানে চাহিয়া মা বলিলেন, "ওঁরা কি বলতে এসেছিল? কোনো দরকারী কাজ আছে?—"

প্রসন্নভাবে নমিতা বলিল, "না, না, কিছুই না! ডাক্ থেকে ফিরে যাচ্ছিলেন, তাই দেখা করে গেলেন।"

একটু নীরব থাকিয়া মা পুনশ্চ বলিলেন, "স্মিথ্, সুরসুন্দর, এদের নাম করে কি সব বলছিলেন নয়?"

নমিতা ভীত হইল। মা তাহা হইলে বাহির হইতে ডাক্তারবাবুর কথা শুনিতে পাইয়াছেন! কি উৎপাত! একে দুর্ভাবনা ও উদ্বেগে তাহার শরীর-মন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, তাহার উপর আবার এই সব ছেঁড়া-ন্যাঠা উপসর্গ!.....মা'র মনটা হাল্কা করিয়া দিবার জন্য নমিতা অগ্রাহ্যের ভাবে অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ; বল্লেন, ওঁরা বিদেশী, লোক ভাল নয়; ওঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা অন্যায়।"

শঙ্কিত কণ্ঠে মা বলিলেন, "অন্যায়?"

নমিতা ক্ষণেক নীরব রহিল; তারপর ঈষৎ জোরের সহিত বলিল, "হ্যাঁ, ওদের মতে!.....কাজকর্ম্ম না থাকলে পরকুৎসা নিয়ে সময় কাটানই অনেক মানুষের অভ্যাস। যার তার সম্বন্ধে যা-হোক্, তা-হোক, বলে দিতে পারলেই হোল; ওতে ত পয়সা-কড়ির খরচ নেই!"

সংশয়-ভীত দৃষ্টিতে কন্যার মুখপানে

চাহিয়া মাতা বলিলেন, "দ্যাখো, তবু ত বল্‌ছেন্‌, মা! স্মিথ্‌—হেন মানুষ, তাঁর সম্বন্ধেও……।" তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল। তিনি থামিলেন।

একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে নমিতার বুক কাঁপিয়া উঠিল। নতমুখে সে ক্ষণকাল স্তব্ধ রহিল; তারপর ধীরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শান্ত কোমল কণ্ঠে বলিল, "যার যা ইচ্ছে, সে তাই বলুক, মা!—মাথার উপর যিনি আছেন, তিনি সত্য-মিথ্যা সবই জান্‌ছেন্‌। তাঁর পানে চেয়ে কাজ করে যাব, তারপর যা তাঁর ইচ্ছা তাই হবে।"

মাতার ভয়ত্রস্ত বুক কাঁপাইয়া একটা গভীর নিঃশ্বাস বাহির হইল। কিছু না বলিয়া তিনি ঘরের বাহির হইয়া আসিলেন। নমিতাও পিছু পিছু বাহির হইয়া আসিল।

মা আসিয়া ক্লান্ত দেহে বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। নমিতা তাঁহার পায়ের কাছে আড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া নিঃশব্দে পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

মুক্ত-মন্দিরে।

রুদ্ধ দুয়ারে আসি', নিতি নিতি ঘা দিয়ে,
ফিরে যাই ভগ্নপ্রাণে, ব্যর্থ-মনোরথ হ'য়ে!
ল'য়ে আসি সযতনে ফোটা-ফুলে ভরা সাজি,
ফিরে যাই তাই ল'য়ে—অফুৎস্থষ্ট-ফুলরাজী!
ডেকে বলি, "কে আছ গো? মুক্ত করে দাও দ্বার,
ভিতরে দেবতা মোর; পূজিব পা-দু'টী তাঁর!"
কাহারও সাড়া-শব্দ কোন দিন পাই নাই,
আঁধারেই এসে একা, আঁধারেই চলে' যাই!

* * * * *

একদিন পূর্ণিমার ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্নায়,
না লয়ে' কুসুম কোন, গেছি সেথা অনিচ্ছায়!
স্থির জানি মনে মনে, রুদ্ধ সে মন্দির মোর;
জানি না যে, অমানিশা হইয়া গিয়াছে ভোর!
চাঁদের আলোয় দেখি মন্দিরের মুক্তদ্বার,
কে যেন সাজিটী ভরে' রেখে গেছে ফুলভার!—
পরিপূর্ণ জীবনের পরিপূর্ণ আশা লয়ে'
প্রবেশিনু জ্যোৎস্নায় স্বরগের সে নিলয়ে।

শ্রীগুণমণি দেবী।

অষ্টাবক্রগীতা।

যুগ যুগ ধরিয়া আমাদিগের দেশের নরনারী তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া এই জরা-মৃত্যু-রোগ-শোক-তাপময় অনিত্য সংসার হইতে মুক্তি-লাভ করিবার জন্য কি গভীর চিন্তা ও কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন! তাঁহাদের সেই তপঃ-সম্ভূত জ্ঞানরাশি অদ্য আমাদিগকে স্তম্ভিত করিতেছে! নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল এই ধরাধামের উপর দিয়া ঘোর বিপ্লব-বিদ্রোহের সহস্র ঝঞ্ঝাবাত প্রবাহিত হইলেও, ধনবিভব সমুদয় লুণ্ঠিত হইলেও, পুরুষপরম্পরাক্রমে

দেশবাসী সেই পূর্ব্বতন ঋষিদিগের আবিষ্কৃত সত্যসকল সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া চলিয়া আসিতেছে। গ্রন্থাকারে আবদ্ধ হইয়া ঋষিদিগের সেই জ্ঞানালোক অদ্যাপি শত সহস্র বিপথগামী পথিককে সৎপথে পরিচালিত করিতেছে। অষ্টাবক্রগীতা এই শ্রেণীরই অন্তর্গত। ইহা ব্রহ্মবিদ্যার উদ্বোধক একখানি অত্যন্ত উপাদেয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রকৃত নাম অবধূতানুভূতি * (অর্থাৎ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর অনুভবের বিবরণ)। ইহা মহর্ষি অষ্টাবক্র-প্রণীত বলিয়া সাধারণতঃ অষ্টাবক্রগীতা-নামেই প্রচলিত। ক্বচিৎ অধ্যাত্মশাস্ত্র-নামেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, এই গ্রন্থপ্রণেতা মহর্ষি গর্ভবাস-কালেই সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হইয়াছিলেন। মহাভারত ও পুরাণপ্রভৃতিতে তাঁহার জীবনের বহুঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতান্তর্গত বনপর্ব্বের ১৩২, ১৩৩ ও ১৩৪তম অধ্যায়ে তাঁহার জীবনী যেরূপ বিবৃত হইয়াছে, তাহা এস্থানে সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

মহর্ষি উদ্দালকের কহোড়-নামে এক ছাত্র ছিলেন। তিনি অধ্যয়ন-সমাপ্তির পর গুরুকন্যা সুজাতাকে বিবাহ করিয়া গুরুগৃহে বাস করিতে থাকেন। কালক্রমে ঋষিকন্যা সুজাতা গর্ভবতী হইলেন। একদা গর্ভস্থ বালক পিতার বেদাধ্যয়ন শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"হে পিতঃ, আপনি সমস্ত রাত্রি বেদাধ্যয়ন করেন, কিন্তু তথাপি তাহা সম্যক্ পঠিত হয় না। আমি আপনার প্রসাদে গর্ভে থাকিয়াই সাঙ্গ বেদ-চতুষ্টয় ও নিখিল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি; তন্নিমিত্তই কহিতেছি যে, উহা আপনাকর্ত্তৃক সমীচীনরূপে পঠিত হইতেছে না।" মহর্ষি কহোড় তদ্বাক্যে অপমানিত হইয়া কহিলেন, "যেহেতু তুমি গর্ভে থাকিয়াই এতদূর বক্রস্বভাব, তজ্জন্য তোমার অঙ্গের অষ্টস্থান বক্র হইবে।" এই শাপের জন্য বালক অষ্টস্থানে বক্র হইয়া ভূমিষ্ঠ হ'ন্ এবং অষ্টাবক্র-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। উদ্দালকের শ্বেতকেতু নামে এক পুত্র জন্মে। তিনি বয়সে অষ্টাবক্রের তুল্য ছিলেন। কহোড় আসন্নপ্রসবা স্ত্রীর বাক্যে ধনার্থী হইয়া বিদেহরাজ জনকের সভায় গমন করেন, এবং তথায় বরুণপুত্র বন্দিকর্ত্তৃক বিচারে পরাস্ত হইয়া পণানুসারে সমুদ্রমগ্ন হ'ন্। পিতার এই বৃত্তান্ত অষ্টাবক্রের নিকট গোপন করা হয়। অষ্টাবক্র উদ্দালকের প্রতি পিতার ন্যায় এবং মাতুল শ্বেতকেতুর প্রতি ভ্রাতার ন্যায় ব্যবহার করিতে থাকেন। দ্বাদশবর্ষ-বয়ঃক্রমকালে অষ্টাবক্র একদিন শ্বেতকেতুকে উদ্দালকের ক্রোড়ে দেখিয়া আকর্ষণ করেন। তাহাতে শ্বেতকেতু বলেন—"ইহা তোমার পিতার ক্রোড় নহে।" এই বাক্যে ক্ষুব্ধ হইয়া অষ্টাবক্র মাতার নিকট গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হ'ন্। পরে তিনি মাতুল শ্বেতকেতুকে সঙ্গে লইয়া জনকের সভায় গমন করিয়া, বন্দীকে পরাজিত করিয়া বরুণলোকবাসী পিতাকে উদ্ধার করেন এবং গৃহে প্রত্যাগমনকালে পিতার উপদেশানুসারে সমঙ্গা-নদীর জলে স্নান করিয়া সম-অঙ্গবিশিষ্ট হন্। কিন্তু অঙ্গের

---

* যো বিলঙ্ঘ্যাশ্রমান্‌বর্ণানাত্মন্যেব স্থিতঃ পুমান্।
অতিবর্ণাশ্রমী যোগী অবধূতঃ স উচ্যতে॥
যস্মাদক্ষরস্থাৎ বরেণ্যত্বাৎ ধূতসংসারবন্ধনাৎ।
তত্ত্বমস্যর্থসিদ্ধত্বাদবধূতোঽভিধীয়তে॥

বক্রতা দূর হইলেও তাঁহার 'অষ্টাবক্র'-নাম দূর হয় নাই।

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের উপোদ্‌ঘাত-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আখ্যানটী প্রচলিত আছে। একদা মিথিলাধিপতি জনক চিন্তা করিতে থাকেন—"এই সংসার সদাই দুঃখপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়! আমরা কিছুক্ষণ সুখভোগ করিতে না করিতেই অতর্কিতভাবে দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়! কখন্ কিরূপভাবে দুঃখ আসিবে, তাহার কোনও নিশ্চয়ই পাওয়া যায় না। আমরা যতই সাবধান হই না কেন, যতই শ্রমশীল, উপার্জ্জনশীল অথবা ধনশালী হই না কেন, একেবারে দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি না। অতি-কষ্টে বর্ত্তমান দুঃখ-সকল হইতে পরিত্রাণের উপায় করিতে না করিতে আবার বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হয়! এমন কি, সুখভোগ-কালেও দুঃখের আশঙ্কায় বিদ্যমান সুখও তিক্ত বলিয়া বোধ হয়। আবার একজাতীয় সুখ বহুবার ভোগ করিলে, তাহা হইতে পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দ পাওয়া যায় না। তখন যদি পুনরায় সুখের মাত্রা অধিক করিবার জন্য কৌশল অবলম্বন করা যায়, তবে ভোগাতি-শয্যে শরীর বিকল হইয়া পড়ে এবং চিত্ত অনবহিত ও প্রমাদযুক্ত হইয়া বহুতর বিপদ্-রাশির মধ্যে ধাবিত হয়। বস্তুতঃ, সুখেই হউক্, দুঃখেই হউক্, কোন প্রকারেই আমরা নিজেকে নিরাপদ্ বোধ করিতে পারি না। অতএব কিরূপে এই অসার সংসারের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহাই আমাদের সর্ব্বপ্রধান চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। কিন্তু মুক্তপুরুষ, অর্থাৎ যিনি স্বয়ং সংসারের সকল বন্ধন হইতে মুক্ত, সেই পুরুষ ব্যতিরেকে আর কাহারও নিকট যথার্থ উপদেশ পাওয়া যাইতে পারে না।" যখন রাজা জনক এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, তখন সেই স্থলে যদৃচ্ছা-ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষি অষ্টাবক্র আসিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হন্। তাঁহাকে দেখিয়া রাজার মনে হয়, 'এই ব্রাহ্মণ অত্যন্ত কুরূপ।' সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ অষ্টাবক্র রাজার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "হে রাজন্, আপনি দেহদৃষ্টি-পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মদৃষ্টিপরায়ণ হউন্। দেহ বক্র হইলেও আত্মা কখনও বক্র হয় না। হে রাজন্, যেরূপ নদী বক্র হইলেও তাহার জল বক্র হয় না, যেরূপ ইক্ষুযষ্টি বক্র হইলেও তাহার রস বক্র হয় না, সেইরূপ পাঞ্চভৌতিক এই দেহ বক্র হইলেও, আত্মা কখনও বক্র হয় না। আত্মা নির্লিপ্ত, নির্ব্বিকার, সর্ব্বব্যাপী, জ্ঞানময়, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, অখণ্ড, অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অদাহ্য, অশোষ্য, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, এবং মুক্ত-স্বভাব। অতএব হে রাজন্, আপনি দেহদৃষ্টি ত্যাগ করিয়া, আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন হউন্।" ইত্যাকার বাক্য শ্রবণ করতঃ রাজা ব্রহ্মজ্ঞ গুরু-সন্দর্শনে সিদ্ধমনোরথ হইয়া মহর্ষির চরণবন্দনাপূর্ব্বক তাঁহার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা প্রার্থনা করিলেন। তখন অষ্টাবক্র যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহাই অষ্টাবক্রগীতা-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইহার মূল ও অনুবাদ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে।

বিশ্বেশ্বরস্বামি-প্রণীত অধ্যাত্মপ্রদীপ-নামে এই গ্রন্থের একখানি উৎকৃষ্ট টীকাগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এই টীকাও মুদ্রিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পূর্ণানন্দতীর্থ, ভাস্করানন্দস্বামী

এবং মুকুন্দমুনি যথাক্রমে এই গ্রন্থের তিনখানি টীকা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এগুলি অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই।

অষ্টাবক্রগীতা যে কত প্রাচীন, তাহা স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। কিন্তু ইহা যে একখানি অতিপ্রাচীন গ্রন্থ তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, ইহার রচনাপ্রণালী অত্যন্ত সরল। দ্বিতীয়তঃ, ইহার সরলতা সত্ত্বেও ইহার চারিখানি বা ততোঽধিক টীকা বিরচিত হইয়াছে। অত্যন্ত প্রাচীন না হইলে এই অতিসরল গ্রন্থের এতগুলি টীকা হইত না। তৃতীয়তঃ, ইহা অদ্যোপান্ত সরল অনুষ্টুপ্‌ছন্দে বিরচিত হইয়াছে। অতএব সম্ভবতঃ দীর্ঘচ্ছন্দঃসকল উদ্ভাবিত হইবার পূর্ব্বেই ইহা বিরচিত হইয়া থাকিবে। চতুর্থতঃ, এই গ্রন্থের একবিংশ প্রকরণে প্রত্যেক প্রকরণের শ্লোক-সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও, কতকগুলি প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ইহাতে দেখা যায়। এই সমস্ত শ্লোক কালে কালে ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকিবে। এই সকল কারণে ইহাকে একখানি অতি-প্রাচীন গ্রন্থ বলা যাইতে পারে।

অতঃপর মূল ও অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

অষ্টাবক্র-গীতা।

প্রথম-প্রকরণ।

জনক উবাচ।—

কথং জ্ঞানমবাপ্নোতি কথং মুক্তি র্ভবিষ্যতি।
বৈরাগ্যঞ্চ কথং প্রাপ্যমেতৎ ত্বং ব্রূহি মে প্রভো ॥১॥

রাজা জনক মহর্ষি অষ্টাবক্রকে বলিলেন, "হে প্রভো, কিরূপে (মনুষ্য) প্রকৃতজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, কিরূপেই বা (তাহার) মুক্তি হইতে পারে এবং কি উপায়েই বা বৈরাগ্য-লাভ হয়—ইহা আমাকে বলুন। ১।

অষ্টাবক্র উবাচ।

মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তাত বিষয়ান্ বিষবত্ত্যজ।
ক্ষমার্জ্জবদয়াতোষসত্যং পীযূষবদ্ ভজ ॥২॥

অষ্টাবক্র বলিলেন।—হে তাত, যদি মুক্তির অভিলাষ কর, তবে ভোগবাসনা বিষের ন্যায় ত্যাগ কর এবং ক্ষমা, সরলতা, দয়া, সন্তোষ ও সত্য অমৃতের ন্যায় গ্রহণ কর।২।

ন পৃথ্বী ন জলং নাগ্নির্ন বায়ুর্দ্যৌর্ন বা ভবান্।
এষাং সাক্ষিণমাত্মানং চিদ্রূপং বিদ্ধি মুক্তয়ে ॥৩॥

(হে রাজন্,) আপনি পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু অথবা আকাশ নহেন; (অর্থাৎ পঞ্চভূতাত্মক দেহ আত্মা নহে।) মুক্তিলাভার্থ এই সকলের সাক্ষী আত্মাকে চিন্মাত্র বলিয়া অবগত হও।৩।

যদি দেহং পৃথক্‌কৃত্য চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি।
অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধমুক্তো ভবিষ্যসি ॥৪॥

যদি আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া চিৎস্বরূপে অবস্থান করিতে পার, তবে এই-ক্ষণেই সুখী, শান্ত ও সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।৪।

ন ত্বং বিপ্রাদিকো বর্ণো নাশ্রমী নাক্ষগোচরঃ।
অসঙ্গোঽসি নিরাকারো বিশ্বসাক্ষী সুখী ভব ॥৫॥

তুমি ব্রাহ্মণাদি-বর্ণী নহ, তুমি ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি আশ্রমধারী নহ। তুমি ইন্দ্রিয়সমূহের অগোচর। তুমি চিত্তধর্ম্মের দ্বারা অলিপ্ত, নিরাকার এবং জগতের সাক্ষিমাত্র—(আত্মাকে এইরূপ জানিয়া) সুখী হও।৫।

ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখং দুঃখং বাসনানি ন তে বিভো।
ন কর্ত্তাসি ন ভোক্তাসি মুক্ত এবাসি সর্ব্বদা ॥৬॥